দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

ফিতনা আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

সূচীপত্র

পথভ্রষ্ট রহমানীর ফতোয়া: ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নাজায়েয!! ৬

জাতীয়তাবাদ (Nationalism): ইসলাম ধ্বংসের মোক্ষম হাতিয়ার! ১১

শিয়া মতবাদঃ ইসলামের নামে ভয়ংকর কুফুরি বিশ্বাস । ১৪

ইসলামী আইন ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ২৯

জুলহাস মান্নানের জাহান্নাম যাত্রার ফলে যারা আনন্দিত হয়েছিলেন তাদের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক প্রতিবেদন ৩৮

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন-১ ..... ৪১

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন-২ ..... ৪৪

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৩ ..... ৪৮

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৪ ..... ৫১

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৫ ..... ৫৬

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৬ ..... ৫৯

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৭ ..... ৬৫

কুফরে আমলী সম্পর্কে জরুরী কয়েকটি বিষয়: ৬৫

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৮ ..... ৭১

৪. একটি মহা সংশয়: নিরানব্বইটা কুফরী করলেও কাফের হয় না! ৭১

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৯ ..... ৭৮

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১০ ..... ৮২

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১১ ..... ৮৬

ইয়াহুদী আলেমদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন: ৮৬

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১২ : ৯৩

আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন.....৯৩

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১৩ .....৯৭

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১৪.....১০০

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু ৪৫৬হি.) এর সংশয় নিরসক বক্তব্য: ১০০

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ (১-৮) ১০৬

হামাসের আসল রূপ ১৩০

দারুল ইসলাম ও দারুল হরব: আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (মৃত্যু: ৮৫৫হি.) বনাম মুফতী তাকী উসমানী ১৩৬

মুফতী তাকী উসমানী এবং ইসলামী খেলাফত ও রাজনীতি-১..... ১৪২

মুফতী তাকী উসমানী এবং ইসলামী খেলাফত ও রাজনীতি-২ .....১৪৮

পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কিভাবে কায়েম হবে? [তাকী উসমানী সাহেবের বয়ান।].....১৫২

বিশ্বের সবচাইতে ধনী ও রহস্যে ঘেরা পরিবার ‘রথসচাইল্ড’ ১৬১

কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার ত্বরীকা এবং প্রচলিত তাবলীগিদের গোমরাহি! ১৬৫

আপনার সন্তানের খবর নিন; সে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী না তো? ১৭৩

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (ঝবপঁষধৎরংস) ও তার অনুসারি(সেকুলার)দের বিধান!! ১৭৫

মক্কী যিন্দেগী এবং আমাদের বর্তমান দুর্বল অবস্থার মধ্যকার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যবধান! ১৭৮

ভোট: ইসলামের নামে ধোঁকা!.....১৮০

ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা- একটি সংশয় ও নিরসন!.....১৮৬

পথভ্রষ্ট রহমানীর ফতোয়া: ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নাজায়েয!!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৮-২৭-২০১৭

পথভ্রষ্ট খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছে। তার মতে ভারত দারুল আমান। ভারতের মুসলমানদের সাথে ভারত সরকারের চুক্তি হয়ে গেছে। এখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে গাদ্দারী হবে। বরং মুসলমানদের দায়িত্ব হল নিজ দেশ মনে করে ভারতের সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা করা। এমনকি ভারতের সেনাবাহিনিতে যোগ দিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা।

এখানে একটা আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ভারতে তো মুসলমানরা হিন্দু কতৃক নির্যাতিত। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু প্রতিনিয়তই হিন্দুদের হাতে দলিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় তো চুক্তি বহাল রয়েছে বলে ধর্তব্য হবে না। কারণ, চুক্তি তো হয়েছিলই জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার জন্য। এখন যখন আর নিরাপদ নেই তখন তো চুক্তির কোন ফায়েদা রইল না। কাজেই চুক্তি ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে। ফলে হিন্দুদের জান-মাল অন্য সকল হরবীদের মতই মুসলমানদের জন্য হালাল বলে গণ্য হবে।

ভ্রষ্ট রহমানী এর উত্তর দিয়েছে, নির্যাতন যা হচ্ছে তা সরকারিভাবে হচ্ছে না। সাধারণ হিন্দুরা নির্যাতন করছে। সরকারি আইনে তো নির্যাতন নিষেধ। যেহেতু সরকারি আইনে নির্যাতন নিষিদ্ধ, তাই জনগণ কতৃক নির্যাতন সরকার কতৃক নির্যাতন বলে গণ্য হবে না। ফলে সরকারের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তা আপন তবিয়তেই বহাল আছে। কাজেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয হবে না বরং গাদ্দারী বলে গণ্য হবে।

এই হল পথভ্রষ্টের বক্তব্য। *'জাদীদ ফিকহি মাসায়েল'* নামক কিতাবে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের আলোচনায় সে এই মন্তব্য করেছে।

বাস্তবতা কি?

প্রথমত কথা হল, ভারত সরকারের সাথে মুসলমানদের কোন চুক্তি নেই। বরং ভারত মুসলমানদের ছিল। হিন্দুরা ইংরেজদের সহায়তায় তা জবরদখল করে নিয়েছে। এখন মুসলমানদের উপর ফরয হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের হিন্দুস্তান আবার ফিরিয়ে আনা এবং তাতে নববী আদলে খেলাফত কায়েম করা।

(চুক্তি কাকে বলে? কার সাথে কে চুক্তি করবে? কি কি শর্তে করবে? কি কি কারণে চুক্তি ভেঙ্গে যায়? ... ইত্যাদী বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।)

দ্বিতীয়ত যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তাদের সাথে এক সময় চুক্তি ছিল তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের জান-মাল হরণ করা জায়েয। কেননা, মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর আঘাত হানার দ্বারা হিন্দুরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

প্রশ্ন হল- রহমানী যে বলেছে, হামলা সরকারিভাবে হচ্ছে না, বেসরকারিভাবে হচ্ছে- সেটার কি জওয়াব?

জওয়াব:

হামলা কি শুধু বেসরকারিভাবেই হচ্ছে, না'কি সরকারের ছত্রছায়ায়ও হচ্ছে তা দুনিয়ার সামান্য খবর রাখেন মত ব্যক্তির কাছেও অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয়ত:

চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার জন্য সরকারিভাবে হামলা হওয়া তো শর্ত নয়। সরকারের সম্মতি থাকাই যথেষ্ট। এমনকি হামলার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সরকার হামলাকারীকে প্রতিহত করে চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে তাহলে এতটুকু চুপ থাকাই সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং মুসলমানদের জন্য তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের মাল লুণ্ঠন করা বৈধ বলে গণ্য হবে। সরকারিভাবে হামলাও শর্ত নয়, সরকারের সম্মতিতে হামলা হওয়াও শর্ত নয়।

শরহুস সিয়ারিল কাবীরে বলা হয়েছে,

إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد. فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد ... فإن فعل ذلك جماعتهم، أو أميرهم، أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه، فحينئذ يكون نقضا للعهد منهم، لأن فعل أميرهم يشتهر لا محالة، والواحد منهم إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه فكأنهم أمروه بذلك ... ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم .اهـ

"তবে যদি তাদের থেকে খিয়ানত প্রকাশ পায় (তাহলে চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং তাদেরকে কতল ও বন্দী করা বৈধ হয়ে হবে।) যেমন- তাদের সাথে শর্ত ছিল যে, তারা আমাদের কাউকে হত্যা বা বন্দী করবে না। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তা করে (অর্থাৎ আমাদের কাউকে হত্যা বা বন্দী করে)। তাহলে তাদের উক্ত কর্ম চুক্তি ভঙ্গ বলে সাব্যস্ত হবে। তখন তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করতে আমাদের জন্য কোন বাধা-নিষেধ নেই, যেমন চুক্তির আগে তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা আমাদের জন্য বৈধ ছিল। ... যদি উক্ত কর্ম তারা তাদের জামাআত নিয়ে করে থাকে কিংবা তাদের আমীর তা করে থাকে কিংবা প্রকাশ্যভাবে তাদের কোন একজন তা করেছে অথচ তারা জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রতিহত করেনি, তাহলে তাদের চুক্তি ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে। কেননা, তাদের আমীরের কর্মটি প্রকাশ্যে হবে অবশ্যই। আর তাদের কোন একজন যখন উক্ত কর্মটি প্রকাশ্যে করেছে অথচ তারা তাকে প্রতিহত করেনি তাহলে ধরা হবে যেন তারা তাকে তা করতে আদেশ দিয়েছে। আর প্রকাশ্যে এমন কর্মে লিপ্ত হওয়া আমাদের ও তাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর।" [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১৬৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

أن المستأمنين لو غدربهم ملك أهل الحرب، فأخذ أموالهم وحبسهم ثم انفلتوا : حل لهم قتل أهل الحرب وأخذ أموالهم، باعتبار أن ذلك نقض للعهد من ملكهم وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه، أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك.اهـ.

"দারুল হরবের রাষ্ট্রপ্রধান যদি চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথে গাদ্দারী করে তাদের মাল হরণ করে নেয় এবং তাদেরকে বন্দী করে ফেলে এরপর কোনভাবে তারা ছুটে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে উক্ত হরবীদের কতল করা এবং তাদের মাল লুট করা তাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত কর্ম তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য। তদ্রূপ হরবীদের কোন এক ব্যক্তিও যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে তা করে থাকে কিংবা তার এ কাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান তাকে বাধা না দেয় তাহলেও (তা চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং তাদের জন্য হরবীদেরকে কতল করা এবং তাদের মাল লুট করা বৈধ হয়ে হবে।)" [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৫১]

দেখুন! আবার দেখুন! ভাল করে দেখুন! কত পরিষ্কার কথা-

"কিংবা প্রকাশ্যভাবে তাদের কোন একজন তা করেছে অথচ তারা জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রতিহত করেনি, তাহলে তাদের চুক্তি ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে। কেননা ... তাদের কোন একজন যখন উক্ত কর্মটি প্রকাশ্যে করেছে অথচ তারা তাকে প্রতিহত করেনি তাহলে ধরা হবে যেন তারা তাকে তা করতে আদেশ দিয়েছে।"

"তদ্রূপ হরবীদের কোন এক ব্যক্তিও যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে তা করে থাকে কিংবা তার এ কাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান তাকে বাধা না দেয় তাহলেও (তা চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং তাদের জন্য হরবীদেরকে কতল করা এবং তাদের মাল লুট করা বৈধ হয়ে হবে।)"

এমন পরিষ্কার বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি বহাল আছে বলে মন্তব্য করা সম্ভব!? যেখানে একজন হামলা করলেই চুক্তি ভেঙ্গে যায়, তাদের জান-মাল বৈধ হয়ে যায়, সেখানে আজ যুগ যুগ ধরে সমগ্র ভারতে সরকারি বেসরকারি সকল পন্থায় গোটা হিন্দু জাতীর দ্বারা মুসলমানরা যেখানে নির্মম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, হাজারো নয় লাখো কোটি মুসলমান নির্মমভাবে নিহত হচ্ছে, হাজারো হাজার মা বোন পাশবিকতার শিকার হচ্ছে, সহায় সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ভিটেমাটিহীন করা হচ্ছে- সেখানে কোন বিবেকবান বলতে পারে এখনও তাদের সাথে চুক্তি বহাল আছে আর মুসলমানদের উপর ফরয উক্ত চুক্তি রক্ষা করা এবং ভারতের মালাউনেদের জান মালের উপর কোনরূপ আঘাত না

হানা??!! একমাত্র রহমানীর মত পথভ্রষ্টরাই এমন ফতোয়াবাজি করতে পারে। শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞরাই কেবল এমন মূর্খতাসূলভ মন্তব্য করতে পারে। কিংবা তারাই করতে পারে যারা দুনিয়ার সামান্য সুখ-সুবিধা আর সুনাম-সুখ্যাতীর লোভে দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি মুসলিম উম্মাহকে এসব অজ্ঞ-মূর্খ-পথভ্রষ্ট নামধারী আলেম থেকে হিফাযত কর। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৫৭৫

জাতীয়তাবাদ (Nationalism): ইসলাম ধ্বংসের মোক্ষম হাতিয়ার!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৯-২০১৭

আল্লাহ তাআলা মানব জাতীকে বিভক্ত করেছেন ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে। সকল ঈমানদার ও মুসলমান এক জাতি, আর সকল কাফের ও অমুসলিম এক জাতি। মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, যে জাতি-গোষ্ঠীরই হোক, যে রঙ-বর্ণেরই হোক, যে ভাষাতেই কথা বলুক- তারা পরস্পর ভাই ভাই। তারা পরস্পর ঈমানী বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ। তাদের পরস্পরে মহব্বত, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক। একে অপরকে নুসরত করা, হেফাজত করা, কাফের-মুশরেকদের হাত থেকে একে অপরকে রক্ষা করা, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহায়তা করা অত্যাবশ্যক। মোটকথা, ইসলামে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' (শত্রুতা-মিত্রতা) ঈমান ও কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত। একে যদি জাতীয়তাবাদ বলা হয়, তাহলে ইসলাম এ জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি দেয়। একে বলা যেতে পারে ইসলামী জাতীয়তাবাদ। যার মূল ভিত্তি হবে ঈমান ও কুফুর।

পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে। তাদের 'ওয়ালা-বারা' তথা মহব্বত-ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ঐক্য-অনৈক্য সব কিছু এসবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ঈমান ও কুফরে তফাৎ নেই। মুসলিম অমুসলিমের কোন পার্থক্য নেই। মুসলমান-কাফের, ইয়াহুদ-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ কারো মাঝে কোন তফাৎ নেই। যতক্ষণ তারা এক দেশ, এক জাতি কিংবা এক ভাষাভাষী হবে, ততক্ষণ তাদেরকে ভালবাসতে হবে, তাদের সাহায্য-সহায়তা করতে হবে, ন্যায়-অন্যায় সব কিছুতেই তাদের পক্ষাবলম্বন করতে হবে; তাদের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রচলন, ইচ্ছা-অভিলাষ, খাহেশ-প্রবৃত্তি সব কিছুকেই সংরক্ষণ করতে হবে; তা সঙ্গত কি অসঙ্গত, শরীয়ত সম্মত কি শরীয়ত বিরোধি- কোন

কিছুই দেখার সুযোগ নেই। জাতি যেটাকে আইন বানাতে চায়, কুফর কি শিরক- সেটাকেই আইন বানাতে হবে। এভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তিত হচ্ছে। হারাম হালাল হচ্ছে, হালাল হারাম হচ্ছে।

উল্লেখ্য, জাতীয়তবাদের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শাসন-কর্তৃত্ব মুছে ফেলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের একতা-ঐক্য বিলুপ্ত করে তাদেরকে পরস্পর বিদ্বেষী কতগুলো দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে পরিণত করা আবশ্যক ছিল। জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে পশ্চিমারা এ কাজটিই করতে সক্ষম হয়েছে। দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি: যেখানে যেটা সুবিধা মনে করেছে, সেটারই ধোঁয়া তুলে এক ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। সৌহার্দ-ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দ্বন্ধে লিপ্ত করেছে। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে দিয়ে বাকি সমগ্র উম্মাহ থেকে বে-খবর বরং দুশমনে পরিণত করেছে। ফলত মুসলিম জাতি পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই জাতীয়তাবাদের কারণে আজ আরাকান সমস্যা মুসলিমদের সমস্যা না হয়ে বার্মার স্থানীয় সমস্যা বিবেচিত হচ্ছে। কাশ্মির সমস্যা ভারতের, চেচনিয়া সমস্যা রাশিয়ার স্থানীয় সমস্যা ধরা হচ্ছে। ফিলিস্তিন, আফগান, শাম, ইরাক- সবখানে একই কথা। এগুলো কোন কিছুই যেন মুসলিমদের সমস্যা নয়। এসব নির্যাতিত মুসলমানকে উদ্ধার করা, তাদেরকে নুসরত করা যেন মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বে পড়ে না। এগুলো সব স্থানীয় সমস্যা। কারণ, তারা আমাদের দেশের লোক নয়। তারা আমাদের ভাষায় কথা বলে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে ভারত রক্ষায় হিন্দুদের সাথে হয়ে মুসলমানকেও লড়তে হবে- কারণ, সবাই ভারতী। হিন্দু-মুসলিম, নাস্তিক-মুরতাদ সকলে মিলে বাংলার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে- কারণ সবাই বাংলাদেশী। এভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরিক-নামধারী মুসলমান সকলে মিলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে কিছুতেই পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ, মুসলমানরা ইসলাম চাইলেও, জাতীর কাফেররা কখনই ইসলাম চাইবে না। তাই জাতীয়তাবাদিদেরকে এমন আইন গ্রহণ করতে হবে- হিন্দু-মুসলিম, খৃস্টান-বৌদ্ধ,

নাস্তিক-মুরতাদ সকলেই যার প্রতি সন্তুষ্ট। এভাবে জাতীয়তাবাদ আল্লাহর রুবূবিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করে নগণ্য মাখলুককে রবের আসনে সমাসীন করবে, যা সুস্পষ্ট কুফর। ফলে জাতীয়তাবাদি রাষ্ট্র কাফের রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য।

অতএব, এই জাতীয়তাবাদ ইসলামের বিপরীতে নব-উদ্ভাবিত এক কুফরী মতবাদ। যারা এই মতবাদের প্রবর্তক, প্রচারক, ভক্ত; এর জন্য জীবন দেয়- তারা কুফরে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তআলা আমাদের হেফাজত করুন। সব মুসলিমকে এক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮১৯৮

শিয়া মতবাদঃ ইসলামের নামে ভয়ংকর কুফুরি বিশ্বাস ।

Umar Faruq

Senior Member

০৪-২২-২০১৭

আমাদের বন্ধু মহলের এক আড্ডায় তুমুল আলোচনা চলছে। এটা আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগের কথা। খবরের কাগজের পাতায় আমেরিকা ও ইরানের পরস্পর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। সাধারণ একজন মুসলিম হিসাবে ইরানের জন্য ভীষণ ফিল করছি মনের ভেতরে। সারা বিশ্বের এটিই একমাত্র ইসলামিক প্রজাতন্ত্র। এর একজন প্রধান ধর্মীয় নেতা আছে যার মর্যাদা সেদেশে সবচেয়ে বেশী। দেশের ভিতর আংশিক হলেও কায়েম আছে শরীয়া আইন। আক্রমণে জর্জরিত মুসলিম বিশ্বের শাসকদের নতজানু আচরণের বিপরীতে তারা হলো নির্ভীক ব্যতিক্রমের মতো যারা সরাসরি ইয়াহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। মুসলিম হিসাবে আর কি চাই। আমাদের বন্ধুদের ভেতরে দু-তিনজন ছিলো যারা খুব ভালো মুসলিম এবং সবার চেয়ে ইসলামী জ্ঞানে অনেক এগিয়ে। তবে সেদিন আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে তারাই ইরানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ্য। মনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম। সেই বন্ধুদের খুব তাচ্ছিল্য করে গালমন্দ করেছিলাম সেদিন। তর্কের শেষে এক বন্ধু বলেছিলো "আমেরিকার কথা শুনে মনে হচ্ছে তারা কালকেই ইরান আক্রমণ করবে। ইনশাআল্লাহ নিশ্চিতভাবে বলতে পারি অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় এটা আমরা দেখে যেতে পারবো না"। আমাদের কয়েকজন মোটামুটি চ্যালেঞ্জের মতো করে বলেছিলো সেটা দু-এক মাসের ভিতরই হয়ে যাবে।

সেদিনের পর দশ বছর পেরিয়ে গেছে। এর ভেতর পৃথিবীর মানচিত্রের বুকে ঘটে গেছে হাজারো মানুষকে নির্বিচারে আক্রমণ ও হত্যা করার ঘটনা। কোনরকম কথার যুদ্ধ ছাড়াই ক্রমাগত আক্রমণ করা হয়েছে বা হচ্ছে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন সহ মুসলিম অধ্যুষিত অগণিত জনপদের উপর। তবে অক্ষত থেকে গেছে একটি দেশ যার নাম ইরান আর অন্যান্য মুসলিম দেশের একটি চিহ্নিত জনগোষ্ঠী, যাদের নাম হলো শিয়া। অবাক ব্যাপার হলো যে, সেই দশ বছর আগেকার কথার যুদ্ধ এখনও চলছে বিরামহীন, ঠিক আগেরই মতো। ইসলামের জ্ঞানে যখন অজ্ঞ ছিলাম এবং আল্লাহর অশেষ

করুণায় ইসলামকে যখন জানতে চেষ্টা করছি, দুটি সময়েই হৃদয়ের ভেতর সবচেয়ে দগদগে অংশটি ছিলো শিয়া-সুন্নী নামে ইসলামের এই মেজর ডিভাইডেশন। এক সময় যখন তা নিয়ে জানার চেষ্টা শুরু করলাম, তখন অবাক হয়ে দেখলাম এক ভয়াবহ ইতিহাস। শিয়া নামের এক বিষফোঁড়া যে ইসলামের গায়ে চেপে বসে ধীরে ধীরে ক্যান্সারে রূপ নিচ্ছে তা সেই প্রথম বুঝতে পারলাম। শিয়া নামের এই ফিতনার কালো থাবা আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে আমাদের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে। হুজাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) এর বরাতে সহীহ মুসলিমের ফিতনাহ অধ্যায়ে একটি হাদীস এসেছে যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফিতনার দরজা এক সময় ভেঙে ফেলা হবে (খুলে দেয়া নয়, একেবারে ভেঙে ফেলা, যা আর কখনো থামানো যাবে না)"। তিনি এই দরজাটির কথাও বলে গিয়েছিলেন। এই দরজা ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। অর্থাৎ উমার রাঃ এর জীবনকাল পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর ভেতরে কোন ফিতনা থাকবে না।

উম্মাহ হবে একক ও ঐক্যবদ্ধ। উমার রাঃ মৃত্যুর পর উসমান ইবন আফফান (রাঃ) যখন খলিফা, সে সময় কুফায় এসে একজন লোক ঘাঁটি গাড়লো যার নাম আবদুল্লাহ বিন সাবাহ। দুহাতে দান করা থেকে শুরু করে মানুষের মন জয় করার জন্য যা যা করা দরকার তার কিছুই করতে এই লোকটি বাদ রাখেনি। অল্পদিনেই কুফার অগণিত মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় তার আসন নিশ্চিত হলো। তার নামটি মুসলিমের মতো শোনালেও প্রকৃতপক্ষে সে ছিলো একজন ইয়াহুদী গুপ্তচর (তখনকার সময়ে আরবীয় অঞ্চলের মুসলিম, খৃষ্টান, ইয়াহুদী কিংবা মুশরিক সকলের নামই এমন ছিলো)। এক সময় যখন ইবন সাবাহ তার আসন সম্পর্কে নিশ্চিত হলো, তখন সে ধীরে ধীরে মানুষকে উসমান রাঃ এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। তার মূল এজেন্ডা ছিলো এই যে, উসমান রাঃ অন্যায়ভাবে আলী রাঃ এর প্রাপ্য খিলাফত নিজের অধিকারে নিয়ে নিয়েছেন। রাসুলের পরিবারের উত্তরাধিকারী হিসাবে মূলতঃ আলীরই খলিফা হওয়া উচিৎ। আহলে বাইত বা রাসুল পরিবারের মতো এমন একটি স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে সে অল্পদিনের ভেতর মানুষকে উসমান রাঃ এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হলো। আর এরই ভিতর দিয়ে যেন ভেঙে গেলো ফিতনার দরজা, চিরতরে। শিয়া মতবাদের পত্তন হলো পৃথিবীর বুকে। মুসলিম খিলাফতের রাজধানী মদীনায় পৌঁছে গেলো এ খবর,

পৌঁছালো স্বয়ং খলিফা উসমান রাঃ এর কানেও। মজলিশে শুরার সদস্য সাহাবাগণ এগিয়ে এলেন যার ভিতরে স্বয়ং আলী রাঃ ও ছিলেন। তারা উসমান রাঃ কে তৎক্ষণাৎ বাহিনী পাঠিয়ে ইবন সাবাহকে শায়েস্তা করার পরামর্শ দিলেন। কোমল হৃদয় উসমান প্রত্যাখ্যান করলেন তা। অল্পদিনের ভিতরই আবদুল্লাহ বিন সাবাহ বাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় মদীনা প্রবেশ করলো। খলিফার কাছ থেকে এবারো কোন বাধা না পেয়ে এক সময় তারা হত্যাই করে বসলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই কন্যার স্বামী এবং পৃথিবীতে বসে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সাহাবী উসমান রাঃ কে।

মুসলিম উম্মাহ দেখতে শুরু করলো ফিতনার কদর্য রূপকে। এরপর পেরিয়ে গেছে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী। মুসলিম নাম ধারণ করে আবদুল্লাহ বিন সাবাহর অনুসারী একদল লোক ইসলামকে ধ্বংসকারীদের সাথেই চিরকাল হাত মিলিয়ে চলেছে শিয়া সেক্ট হিসাবে। এদের বিধ্বংসী বিশ্বাস হতবাক করেছে অগণিত মুসলিমকে। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোষণা মতো অন্য অনেক ফিতনার মতো এই ফিতনাও কখনো নির্মূল করা যায়নি। মনে পড়ে আমার ছোটবেলায় দেখেছি শ্রমিকরা যখন কোন ভারী বস্তু তুলতো বা ঠেলতো তখন "ইয়া আল্লাহ্*....." না বলে বলতো "ইয়া আলী....."। এরকম কাজে একই কথা আমরাও অনেক বলেছি। আপাত দৃষ্টিতে এটা সামান্য কথা বলে মনে হলেও এরই ভেতর যে লুকিয়ে আছে শির্ক ও শিয়া মতবাদের মারাত্মক বিষ, সেটা আল্লাহর কৃপায় অনেক পরে বুঝেছি। আবদুল্লাহ বিন সাবাহর হাত ধরে প্রথম শুরু হয়েছিলো আলী রাঃ এর খিলাফত বঞ্চিত হবার প্রপাগান্ডা। মহাকালের আবর্তে পড়ে সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবার মতো করে এই আলীকেই শিয়াদের একটি দল আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকেই ইলাহ হিসাবে ঘোষণা করেছে।

আলী রাঃ এর প্রতি অতিভক্তির সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরো কিছু হাদীস এবং ঘটনাকে বিকৃত করে এবং তাতে নতুন অংশ জাল করে ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত একটি ভ্রান্ত পথ ইসলামের নামেই ছড়িয়ে দিয়েছে শিয়া বলে নিজেদের পরিচয় দেয়া এই গোষ্ঠীটি। নিজেদের পছন্দমত করে বানানো অগণিত জাল হাদিস, বিকৃত বাণী এবং বিকৃত কুরআন হয়ে থেকেছে তাদের সম্বল। আর যেভাবে তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করেছে, একইভাবে

শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাকী মুসলিম বিশ্বের সাথে। প্রকাশ্য বা গোপনভাবে সাহায্য করেছে কাফির-মুশরিক কিংবা ইয়াহুদী নাসারাদের। শিয়া বিশ্বাস বা ইতিহাস নিয়ে অজস্র আলোচনা পৃথিবীর বুকে হয়েছে। সামান্য পরিসরে আসুন আমরা দেখে নেই শিয়াদের বিধ্বংসী বিশ্বাসগুলো। 'গাদীর খুম' এর হাদীস এবং এর বিকৃতি- শিয়া বিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তিঃ 'গাদির খুম' এই নাম আপনি কখনো শুনেছেন কি? গাদীর খুম হলো সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কয়েকটি হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত একটি কুপ বা কুয়ার নাম। এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাঃ এর ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলেন। এই হাদীস না শুনে থাকলেও তা দোষের কিছু নয়। তবে শিয়া স্টান্টবাজির অন্যতম হলো যে, তাদের সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলে সাধারণ মুসলিমদের এই বিষয়ে অজ্ঞতার সুযোগে তারা কিছুটা বিকৃত করে এই হাদীস শুনিয়ে আপনাকে বোকা বানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। এমনকি কোন শিয়াকে যদি তার স্বপক্ষে একটি দলীল দেবার কথা বলা হয় তাহলে সে এ হাদীসকে উল্লেখ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এজন্য সবার এ বিষয়ে সতর্ক থাকাটা উচিৎ। হাদীসটি আলোচনা করার আগে এই হাদীসের পূর্বকার প্রেক্ষাপট আলোচনাও জরুরী। এর প্রেক্ষাপট অনেক হাদীস গ্রন্থ এমনকি শিয়াদের লেখা কিছু গ্রন্থেও এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনশ যোদ্ধার এক বাহিনী আলী রাঃ এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে সে দলটি বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। আলী রাঃ গণিমতের অংশ থেকে খুমুস (পাঁচভাগের এক অংশ) আলাদা করে রাখেন যার ভিতরে বিপুল পরিমাণ লিলেনের কাপড়ও ছিলো।

সাহাবাদের ভেতর থেকে অনেকে সেই কাপড় থেকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাদের কিছুটা ধার দেয়ার জন্য আলী রাঃ কে অনুরোধ করেন। এর কারণ হলো দলটি সেখানে তিনমাস অবস্থান করছিলো এবং তাদের ব্যবহার্য কাপড়ও যথেষ্ট ছিলো না। কিন্তু আলী রাঃ তা দিতে অস্বীকার করেন এবং তা সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এর কিছুদিন পরে আলী রাঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হজ্জে যোগদানের জন্য তাঁর ডেপুটিকে কমান্ড হস্তান্তর করে মক্কার উদ্দেশ্যে চলে

যান। আলী রাঃ চলে যাবার পর সেই ডেপুটি কমান্ডার সবদিক বিবেচনা করে সৈন্যদলকে লিলেনের কাপড় ধার দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

অল্পদিন পরে পুরো দলটিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যোগ দেয়ার জন্য রওয়ানা করে। দলটির আগমনের খবর পেয়ে আলী রাঃ মক্কা থেকে বেরিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। কাছে এসে তিনি দেখতে পান তাদের গায়ে সেই লিলেনের পোষাক। আলী রাঃ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং তাদের নির্দেশ দেন তৎক্ষণাৎ সে পোষাক খুলে পুরাতন পোষাক পরার জন্য। আলীর নির্দেশ মান্য করলেও দলটির নেতা সহ সকলেই খুব ক্ষুব্ধ হয়। খবরটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে গিয়েও পৌঁছায়। শুনে তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমরা আলীর উপর রাগ করোনা। সে আল্লাহর পথে এতোটাই নিবেদিত একজন লোক যে, এ ব্যাপারে তাকে দোষ দেয়া যায় না"। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণীও দলটির অনেক সদস্যের রাগ প্রশমন করতে পারলো না (হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বুরাইদাহ রাঃ ও এর ভেতর একজন)। দোষারোপ চলতেই থাকলো। মক্কা থেকে মদীনা ফেরার পথে এ দলটি গাদির খুম নামের এক কুপের কাছে যাত্রাবিরতি করলো। সেখানে আলীর নামে আবার অভিযোগ তোলা হলো। এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ক্ষুব্ধ হলেন ও লোকদের ডেকে আলী সম্পর্কে বললেন। মোটামুটি এই হলো গাদির খুম হাদীসের প্রেক্ষাপট। এবার আসা যাক সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত গাদির খুম হাদিসের বর্ণনাতে। হাদিসের বর্ণনাকারী হলেন বুরাইদাহ রাঃ যিনি ইয়েমেনে পাঠানো দলটির একজন সদস্য ছিলেন। বুরাইদাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী কে খালিদের (বিন ওয়ালিদ) কাছে পাঠালেন খুমুসের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) অংশ আনার জন্য, এবং আলীকে আমি অপছন্দ করতাম। আলী খুমুসের অংশের একজন যুদ্ধবন্দীর (যা তাকে রাসুল দিয়েছিলেন) সাথে মিলনের পর গোসল সেরেছিলেন। তা দেখে আমি খালিদকে বললাম, "তুমি কি দেখছো না (যে আলী খুমুস থেকে অংশ নিয়ে ব্যবহার করছে)"? আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছালাম তখন আমরা তাঁকে এ ব্যাপারটা বললাম। তিনি আমাকে বললেন, "ওহে বুরাইদাহ, তুমি কি আলীকে ঘৃণা করো"? আমি বললাম "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "তুমি তাকে এজন্য ঘৃণা

করছো, অথচ খুমুস থেকে এর চেয়ে বেশীই তার প্রাপ্য"। এইটুকু হলো বুখারী ও মুসলিমের হাদীস। এর অতিরিক্ত কিছু অংশ নানা বর্ণনায় অন্য হাদীস গ্রন্থে এসেছে যার ভিতরে দুটি ভাষ্য সহীহ বলে অল্প কয়েকজন স্কলার বলেছেন, যদিও ইবন তাইমিয়াহ সহ সকল প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এর বাইরের কোন বর্ণনাকে সহীহ বলেননি।

এখানে আলোচনার স্বার্থে আমরা দুটি অতিরিক্ত বর্ণনাকে সহীহ ধরে নিচ্ছি।

যে দুটি হলো- ১। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "মান কুনতু মাওলা ফী আলী মাওলা (যার মাওলা আমি, আলীও তার মাওলা)"

২। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহুম্মা ওয়ালী মান ওয়ালাহ ওয়া আদি মান আদাহ (ও আল্লাহ্*, আএ তার (আলী) বন্ধু, তুমি তার বন্ধু হও আর যে তার প্রতি শত্রুতা রাখে তুমি তার শত্রু হও)"। এই দুটি অতিরিক্ত বর্ণনার বাইরেও এই হাদীসের আরো অনেক বাড়তি বর্ণনা রয়েছে যার সবই শিয়াদের তৈরী বা জাল করা। অধিকাংশ শিয়া স্কলার রেফারেন্স হিসাবে এই দুই বর্ণনার অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত বর্ণনাগুলো বলেন না। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো যে, গাদির খুমের হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা বুখারী ও মুসলিমের রেফারেন্স উল্লেখ করলেও প্রায় সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বর্ণনাগুলি একই সাথে চালিয়ে দেয় যদিও সেগুলো বুখারী-মুসলিমে নেই। যাহোক, অতিরিক্ত দুটি বর্ণনার মূল আলোচ্য অংশ হলো 'মাওলা' শব্দটি। আরবী ভাষায় অনেক শব্দেরই একাধিক অর্থ থাকে যার কোন কোনটির থাকে অনেক অর্থ। মাওলা হলো এমনই একটি শব্দ যার রয়েছে বেশ কয়েকটি অর্থ। আর এই বহু অর্থেরই সুযোগ গ্রহণ করেছে শিয়ারা অন্যায়ভাবে।

যেমন 'মাওলা' এর অর্থ হতে পারে কর্তা, মালিক, বন্ধু, ভালোবাসার মানুষ, আযাদকৃত দাস, দাস, কাজিন ইত্যাদি। মাওলা দিয়ে যেমন বন্ধু বুঝায় একই শব্দ দিয়ে এমনকি আল্লাহকেও বুঝায় বাক্যের গতি অনুসারে। এখানে মাওলা শব্দের অর্থ 'ভালোবাসার মানুষ' হিসাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহার করেছেন, যা শিয়ারা না মেনে বরং 'ইমাম', 'খলিফা' কিংবা 'ক্ষমতার উত্তরাধিকারী' হিসাবে এর অর্থ করে। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই যে, পরের অংশটিতে মাওলা শব্দের অর্থ পরিস্কার হয়ে যায়। আসুন আবার দেখে নেয়া যাক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহুম্মা ওয়ালী মান

ওয়ালাহ ওয়া আদি মান আদাহ (ও আল্লাহ্*, যে তার (আলী) বন্ধু, তুমি তার বন্ধু হও আর যে তার প্রতি শত্রুতা রাখে তুমি তার শত্রু হও)"। গাদির খুমের হাদীস নিয়ে শিয়া বাড়াবাড়ির ভয়াবহতা সত্য থেকে তাদের অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। খিলাফতের উত্তরাধিকারের মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কুয়াশাচ্ছন্ন কথা দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন তা হতে পারে না এবং তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না। গাদির খুমের ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখন সেখানে ছিলো মদীনাবাসী সাহাবাগণ। এর সামান্য কিছুদিন আগে বিদায় হজ্জে তিনি মক্কা, মদীনা নির্বিশেষে সকল সাহাবাকে কাছে পেয়েছেন।

সে হিসাবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার জন্য বিদায় হজ্জের ভাষণ ছিলো সেরা সময়, কিন্তু তিনি তখন এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। এই সময়ের আগে কিংবা পরে অসংখ্যবার মুহাজির ও আনসার শীর্ষস্থানীয় সাহাবগণ রাসুলের সাথে বিভিন্ন সময় বসেছেন এবং পরামর্শ করেছেন। আলী রাঃ'র খলিফা বা তাঁর সাক্সেসর হবার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে বলেননি। গাদির খুমের ঘটনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী সম্পর্কে যেভাবে বলেছেন, একইভাবে কিংবা এর চেয়ে জোরালোভাবে তিনি অন্য সাহাবাদের প্রসঙ্গেও অনেকবার বলেছেন। আবু বকরের কথা সরাসরি কুরআনে এসেছে। উমার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আল্লাহর শপথ উমার, তুমি যে পথে হাঁটো, শয়তান সে পথে আসেনা" (বুখারী)। উমার রাঃ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, "আমার পর যদি কোন নবী হতো তা হতো উমার"। তিনি আরো বলেছেন, "উমারের সাথে যদি কেউ রাগান্বিত হলো সে যেন আমার উপর রাগান্বিত হলো এবং উমারকে যে ভালোবাসলো, সে যেনো আমাকেই ভালোবাসলো"। উমার রাঃ এই হাদিসগুলো জানার পরও এগুলোকে তার প্রথম খলিফা হিসাবে মনোনয়নের জন্য ব্যবহার করেননি বা করতে দেননি। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক নবীর উম্মাহর মধ্যে একজন থাকে যে হয় ওই উম্মাহর সবচেয়ে বিশ্বস্ত। আমার উম্মাতের ভেতর সেই লোকটি হলো আবু উবাইদাহ"। মুয়াজ ইবন জাবাল রাঃকে তিনি বলেছেন, "ওহে মুয়াজ, তুমি হলে আমার ভালোবাসার একজন"। আবু জর আল গিফারী রাঃ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আকাশের নীচে এবং মাটির উপর আবু জরের চেয়ে

সত্যবাদী আর কেউ নেই"। এভাবে রয়েছে অসংখ্য উদাহরণ। সুতরাং চাইলে এমন প্রতিজন সাহাবাকে কেন্দ্র করে এক একটি শিয়ার মতো মতবাদ তৈরী করা যাবে।

বুখারী-মুসলিমে উল্লেখিত গাদির খুমের এই হাদীসকে শিয়ারা এতো গুরুত্ব দেয় যে, তারা হাদীসের ঘটনার দিন-ক্ষণ বের করে প্রতি চান্দ্র বছরের ওই দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করে যার নাম 'ঈদে গাদির'। অসংখ্য শিয়া ইনোভেশন বা বিদ'আতের ভেতর ঈদে গাদিরও একটি। গাদির খুম আলোচনার শেষে একটি কথা না বলে পারছিনা। বুখারী, মুসলিম হলো হাদীস গ্রন্থের ভিতর সবচেয়ে বিশুদ্ধ যা শিয়ারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তারা তাদের রচিত জাল ও বানোয়াট হাদীস ভরা কিছু বই ও এর হাদীস সহীহ বলে ঘোষণা দেয়। সেসব হাদীসে আলী রাঃ কে সরাসরি খলিফা হিসাবে উল্লেখ করে অনেক হাদীস আছে। তাহলে তারা কেনো সেসব হাদীসের দিন-ক্ষণ বের করে সেগুলোর একটাকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করেনা? এতে করে তাদের তৈরী করা হাদিসের প্রতি বিশ্বাসের ভেতরটা পরিস্কার বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে বিষদ ও চমৎকার বর্ণা পাবেন এই লিংকে-

http://www.schiiten.com/backup/Ahlel...dir-khumm.html

বারো ইমামের নামে বাড়াবাড়িঃ নিজেদের ভেতর বিভাজন আর অবিশ্বাসের শুরু সহীহ মুসলিমে বর্ণিত কয়েকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারো জন সত্যপন্থী খলিফাহর কথা বলেছেন যার সাথে কম কিংবা বেশী জাল বাক্য ঢুকিয়ে এবং এ নিয়ে চরমতম বাড়াবাড়ি করে শিয়াদের ভেতর তৈরী হয়েছে পরস্পর বিরোধী কিছু উপদল। ইমামের ক্ষমতা নিয়ে এমনই বাড়াবাড়ি তারা করেছে যে, অধিকাংশ শিয়া সেক্ট ইমামকে নিয়ে আল্লাহর সাথে শির্কের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। প্রথমেই দেখা যাক মুসলিমে বর্ণিত বারো খলিফাহর হাদিসগুলো। জাবির বিন সামুরা রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পৃথিবীর বুকে জীবনের ধ্বংস ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ বারোজন খলিফাহ অতিক্রান্ত না হয়"। এরপর তিনি একটি বাক্য বললেন (যা আমি শুনিনি)। আমি তখন আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন। তিনি বললেন, "তিনি বলেছেন তারা সবাই হবে কুরাইশ থেকে"। একইভাবে আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দ্বীন হিসাবে ইসলাম শেষ

দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে, এর ভেতর আসবে বারোজন (সত্যপন্থী) খলিফাহ, যারা সবাই হবে কুরাইশ থেকে"।

(মুসলিম) মুসলিমের এই বর্ণনার বাইরে এই হাদিসের অনেক শিয়া সংস্করণ আছে যার ভেতরে রয়েছে ব্যাপক জাল বা মিথ্যা বর্ণনা যেগুলো এমনকি শিয়াদের স্কলারদের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিমে বর্ণিত বারো খলিফাহ কিংবা শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী বারো ইমামের এই হাদিস নিয়ে শিয়া এবং সুন্নী দু'দলেই রয়েছে অনেক মত। তবে শিয়াদের মতপার্থক্য এ ব্যাপারে এতো বেশী যে এর দ্বারা তাদের নিজেদের বিশ্বাসই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বর্ণিত হাদিসটির সকল বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে বারো জন সত্যপন্থী নেতা হবে কুরাইশ থেকে, কিন্তু শিয়াদের বিশ্বাস হলো এরা সবাই হবে আহলে বাইত বা আলী রাঃ এর বংশধরদের মধ্য থেকে (এরা আলী ও ফাতিমা রাঃ এর বাইরে অন্য কোন স্ত্রী বা কন্যার কাউকে আহলে বাইত হিসাবে ধরে না)। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ না বলে সরাসরি আহলে বাইত উল্লেখ করতেন কোন বক্রতা ছাড়াই। একইভাবে যদি তারা সবাই আহলে বাইত থেকে এসে থাকেন তাহলে প্রথমে আলী রাঃ, এরপর তাঁর সন্তান হাসান রাঃ, এরপর হুসাইন রাঃ, এরপর তাঁর সন্তান, এরপর তার সন্তান এভাবে যদি ধরা যায় তাহলে বারোজনের এই হিসাব হিজরী তৃতীয় শতকেই শেষ হয়ে যায়। তাহলে পরবর্তি আহলে বাইতদের কি হবে?

আর এই যায়গা থেকেই উৎপত্তি হতে শুরু করেছে শিয়াদের নানা অবাস্তব বিশ্বাসের। কেউ কেউ আবার তাদের পছন্দের লোককে ইমাম মাহদি বলে আখ্যা দিয়ে তার সম্বন্ধে নানা বানোয়াট বিশ্বাসের অবতরণা করেছে। আসুন দেখে নেয়া যাক এ সংক্রান্ত কিছু শি'ঈ বিশ্বাস। • হুসাইন বিন আলী রাঃ এর শাহাদাতের পর অধিকাংশ শিয়া ইমাম হিসাবে মেনে নেয় তাঁর পুত্র আলী বিন হুসাইন বা যাইনুল আবিদিনকে। তবে একটি শিয়া গোষ্ঠী তাঁকে না মেনে আলীর পুত্র এবং হাসান-হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মাদ বিন আলী বা মুহাম্মাদ বিন আল হানাফিয়্যাহকে ইমাম হিসাবে ঘোষণা করে এবং তাঁকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদি হিসাবে ঘোষণা করে। তারা বিশ্বাস করে আল হানাফিয়্যাহ পাহাড়ের আড়ালে অজানা গন্তব্যে চলে গেছেন এবন কিয়ামাতের আগে তিনি আবার আবির্ভূত হবেন মাহদি হিসাবে। এই সেক্টটির নাম 'আল কিসানিয়্যাহ'।

• যাইনুল আবিদিনের মৃত্যুর পর অধিকাংশ শিয়া তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ আল বাকিরকে ইমাম হিসাবে মেনে নেয়। তবে একটি গ্রুপ তাঁকে না মেনে যাইনুল আবিদিনের আরেক পুত্র যাইদ আল শহীদকে ইমাম হিসাবে নেয়। এদের 'যাইদি' বলা হয়।

• মুহাম্মাদ আল বাকিরের পর তাঁর পুত্র জাফর সাদিক এবং জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা আল কাজিমকে ইমাম হিসাবে অধিকাংশ মেনে নেয়। কিন্তু একটি গ্রুপ জাফর সাদিকের জীবীত অবস্থায় প্রয়াত পুত্র ইসমাইলকে ইমাম হিসাবে ঘোষণা করে। এদের বলা হয় 'ইসমাইলি'।

• অনেকে মুসা আল কাজিমকে না মেনে ষষ্ঠ ইমামের অন্য দুই পুত্র আব্দুল্লাহ আল আলতাফ এবং মুহাম্মাদ এই দুজনকেই ইমাম হিসাবে মেনে নেয়। তবে অনেকে এদেরকে না মেনে এবং এরপর আর কোন ইমামকেই না মেনে ইমামতের শেষ হয়েছে বলে দাবী করে এবং ইমামত থেকে তাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করে।

• মুসা আল কাজিমকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর অনেকে মুসার পুত্র আলী আর রিদাকে ইমাম হিসাবে মেনে নেয়। কিন্তু এবার অনেক শিয়া আলী আর রিদাকে ইমাম হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং ইমামকে মেনে নেয়া থেকে তাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করে। এদের বলা হয় 'আল ওয়াক্বিফিয়া' বা সাত ইমামের অনুসারী।

• অষ্টম ইমাম হিসাবে আলী আর রিদার পর আকস্মিকভাবে আহলে বাইত থেকে আর কোন ইমামকে না মেনে বাকী চার ইমাম কিয়ামাতের আগের প্রতিশ্রুত মাহদি বলে তাদের পুরানো ধারা থেকে সরে আসে। বারো ইমামের এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না যদি তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত হাদিসের মূল কথাটাকে মেনে নিত যেখানে তিনি সকল সত্যপন্থী খলিফাহকে আহলে বাইতের সদস্য না বলে কুরাইশ বলেছিলেন। এখন দেখে নেয়া যাক সুন্নী স্কলারগণ এই বারো নেতা সম্পর্কে কি বলেছেন। অধিকাংশ সুন্নী স্কলার বলেছেন এই বারোজনের পরিচয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ হিসাবে বলে দিলেও তাদের সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে ইসলামের প্রথম চার খলিফা আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রাঃ এই বারোজনের প্রথম চার জন যা 'খুলাফায়ে রাশিদা'

হিসাবে আসা অন্য হাদিসের আলোকে পরিস্কার হয়। এর বাইরে বিখ্যাত নিষ্ঠাবান ও তাক্বওয়াবান উমাইয়্যা খলিফা উমার বিন আবদুল আজিজকে সকলেই পঞ্চম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আলীর পর হাসান রাঃ কে পঞ্চম উল্লেখ করে উমার বিন আবদুল আজিজকে ষষ্ঠ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সকলেই একমত যে এই চেইনের বারোতম খলিফা হলেন প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদি। বাকী কারা? সকলেই বলেছেন এই জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে। আবু বকর থেকে শুরু করে মাহদি পর্যন্ত বাকী সময়ে তাদেরই মতো নিজের জীবনের চেয়ে আল্লাহ্* ও ইসলামকে বেশী ভালোবাসা তাক্বওয়াবান সেই খলিফাহদের তালিকা হয়তো মানুষ চেষ্টা করে কিয়ামাতের আগেই করতে পারবে, তার আগে নয়। তবে বারো ইমামের এই তালিকার হেরফের এবং আহলে বাইতের উপর বেশী বাড়াবাড়ির কারণে শিয়াদের ঈমান এবং আকিদা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা মোটেও যুক্তিযুক্ত হবেনা। মূল বিষয় হলো এই ইমামদের সম্পর্কে এদের ভয়াবহ আকিদাগত বিশ্বাস যা প্রকাশ্য শির্ক ও কুফর, যা কিনা তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

ইরানের সাম্প্রতিক রেভ্যুলশনের নেতা খোমেনী তার 'হুকুমাত আল ইসলামিয়াহ' নামের বইতে ইমামদের ব্যাপারে শিয়া বিশ্বাস সম্পর্কে পরিস্কার তুলে ধরেছেন। বিষয়টি গুরিত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বর্তমানের অধিকাংশ শিয়া খোমেনীর থিওরী ও খোমেনিজমে বিশ্বাস করে। এই বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন ইমামরা এমন এক আসনে আসীন, যে তাঁরা সকল ফেরেশতা এমনকি রাসুলদের চেয়েও অগ্রগামী। তিনি লিখেছেন ইমমগণ এই পৃথিবীর প্রতিটি অনুর উপর ক্ষমতাবান ও তাঁদের প্রতিটি কাজ কোন রকম প্রশ্ন ও সন্দেহের উর্ধ্বে। তবে এ কথা ও বিশ্বাস শুধু খোমেনীর নয়, বারো বা সাত ইমামে বিশ্বাসী সকল শিয়া এই আকিদা পোষণ করে। শুধু তাই নয়, তাদের অনেকে আরো বিশ্বাস করে যে, ইমামগণ সকল জ্ঞানের মালিক-যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, যা জানা কিংবা অজানা। আল্লাহ্* ক্ষমা করুন।

দেখুন- http://www.schiiten.com/backup/Ahlel...-prophets.html http://www.islamqa.com/en/ref/১০১২৭২/shia

কুরআনের বিকৃতিঃ আল্লাহ্* কুরআনে বলেছেন "নিশ্চয়ই আমি নিজে এ কুরআন নাজিল করেছি এবং আমি নিজেই এর হিফাজত করবো" (সুরা আল হিজর ১৫/৯)।

এ আয়াত বাহ্যিকভাবে বিশ্বাস করার পরও শিয়ারা কুরআনের বিকৃতির এক ভয়াবহ নজির তৈরী করেছে। তাদের একটি অংশের (আল্লাহ্* ভালো জানেন পুরো শিয়া জাতির কিনা) বিশ্বাস যে, বর্তমানের যে কুরআন পৃথিবীতে আছে, তা সম্পূর্ণ নয়। বরং আবু বকর ও উসমান রাঃ সহ সাহাবাগণ কুরআনের দুটি সুরা গোপন করেছেন। এই দুটি সুরা হলো 'সুরা আল বিলায়াত বা বিলায়াহ (বাংলায় 'ব' দিয়ে শুরু হলেও আরবীতে 'ওয়াও' দিয়ে শুরু যার ইংরেজিতে উচ্চারণ সঠিক হবে Wilayyah)' এবং 'সুরা আন নূরাইন'।

বিখ্যাত শিয়া আ'লিম মির্জা মুহাম্মাদ তাক্বী আল নূরী ১২৯৮ হিজরীতে ইরান থেকে প্রকাশিত তার 'ফাজল আল কিতাব ফি ইসবাত তাহরিফ কিতাব রাব্বিল আরবাব' বইতে একথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য অনেক শিয়া আ'লিমও একই কথা লিখেছে তাদের বিভিন্ন বইতে। যেমন মুহসিন ফা'নি আল কাশ্মিরি রচিত 'দাবস্তান মাজহাহিব', মির্জা হাবিবুল্লাহ আল হাশিমি আল খো'ই রচিত 'মানহাজ আল বারাহ আল শরহ নজহ আল বালাঘ', মুহাম্মাদ বাকির আল মাজলিসি রচিত 'তাদক্বিরাত আল আ'ইম্মাহ' ইত্যাদি।

মূলতঃ শিয়াদের ভিতরে এ বিশ্বাস প্রকট এবং আত তাকিয়াহ নামের একটি গোপন বিশ্বাসের কারণে তারা তা প্রকাশ করতে চায় না (যা সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ)। 'আল কাফি' নামের একটি শিয়া বইয়ে ইমাম জাফর সাদিকের (হজরত হুসাইন রাঃ এর প্রপৌত্র ও তাঁর পুত্র ইমাম জাইনুল আবিদিনের পুত্র) ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে যা আরো ভয়াবহ। সেখানে লেখা হয়েছে, একটি লোককে কুরআন প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "তোমাদের কাছে যে কুরআন আছে তা ফাতিমা'র কুরআন থেকে অনেক আলাদা"। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "ফাতিমার কুরআনটা কি"? তিনি বললেন, "তা হলো তোমাদের কুরআনের তিনগুন এবং তোমাদের কুরআনের একটি শব্দও ওর ভিতরে নেই"। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই যে নানাভাবে কুরআনের এই বিকৃতির কথা প্রকাশ করলেও একান্তে নিজেদের ভিতর ছাড়া কুরআনের ওই দুটো বানোয়াট সুরা সম্বলিত কুরআন তারা কখনোই সকলের সামনে প্রকাশ করে না। দেখুন-

http://www.islamqa.com/en/ref/১০১২৭২/shia
http://en.wikipedia.org/wiki/Surah_of_Wilaya_and_Nurayn

ইসলামের প্রথম তিন খলিফাহর উপর শিয়া বিশ্বাসঃ সকল শিয়া মনে করে আলী রাঃ এর কাছ থেকে ইচ্ছাপূর্বক জোর করে খিলাফত কেড়ে নিয়েছেন আবু বকর, উমার ও উসমান রাঃ। এদের মধ্যে বড় একটা অংশ মনে করে তাঁরা ছিলেন কাফির। সামান্য একটি অংশ মনে করে তাঁরা কাফির নন, বরং তাঁরা আলীকে প্রথম খলিফা না বানিয়ে জুলুম করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ একটি তথ্য উল্লেখ করছি। উমার রাঃ এর হত্যাকারী লোকটির নাম ছিলো আবু লুলু যে একজন পার্শিয়ান অগ্নি উপাসক ছিলো। এই লোকটিকে শিয়ারা উপাধি দিয়েছে 'বাবা শুজা-উদ্দীন' বা 'আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী'। ইসলামের মহান নেতাদের কাফির আখ্যা দেয়াঃ শিয়ারা ইসলামের মহান কিছু নেতা, যারা নিজেদের জীবন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে গেছেন তাদের কাফির বলে ঘোষণা দেয়, যার ভেতর আছেন সালাহউদ্দীন আইয়্যুবী। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই যে, সালাহউদ্দীন আইয়্যুবীর সময়কালে পৃথিবীতে শিয়া ও সুন্নীদের দুজন পৃথক খলিফা ছিলো। বাগদাদে ছিলো সুন্নী খলিফা এবং মিশরে ছিলো ফাতিমীয় শিয়া খলিফা। উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে তিনি দীর্ঘদিন শিয়া ফাতিমিয় খলিফার সাথে একীভূত ছিলেন এবং শিয়া খলিফার আনুগত্য করতেন। এক সময় খলিফার শির্ক কুফরের কারণে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অনৈতিকতার কারণে তিনি ফাতিমীয় খিলাফাহকে উৎখাত করেন।

এজন্যই এই মহান লোকটির উপর শিয়াদের ক্ষোভ, যাঁরা হাতে আল্লাহ্* মুসলিমদের জেরুজালেম পুনর্বিজয় দিয়েছিলেন। মুসলিম উম্মাহর সাথে শিয়া বিশ্বাসঘাতকতাঃ এই ইতিহাস বড় দীর্ঘ ও করুণ। শিয়া মতবাদের উদ্যোক্তা ইয়াহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবাহর হাতে উসমান রাঃ এর হত্যার মধ্য দিয়ে এর শুরু। যুগে যুগে শিয়ারা মুসলিম উম্মাহর ভেতর বিভেদ বাড়িয়েছে। তারা উমাইয়্যা খিলাফাহকে ধ্বংস করার জন্য আব্বাসীয়দের সাহায্য করেছে। আব্বাসীয়দের ধ্বংস করার জন্য কাফির তাতারী বাহিনীর সাহায্য করেছে এবং খলিফাকে হত্যা করিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা ইয়াহুদী আর খৃষ্টানদের সাথে গোপন আঁতাত করে থেকেছে যার ব্যাত্যয় এখনো হচ্ছে না। ইরানের উপর আজ বাহ্যিক অর্থনৈতিক অবোরোধ আরোপ করা হয়েছে অথচ তারপরও তাদের সামান্য ক্ষতি হয়নি। অথচ ইরাক বা আফগানের উপর এমন অবোরোধে সে দেশগুলোর কেমন দশা হয়েছিলো তা কারো অজানা নয়। দ্বীনকে বিকৃতি এবং এর প্রচারঃ বারো ইমাম নিয়ে ভয়াবহ শির্ক ও কুফর বিশ্বাসের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

এছাড়াও শিয়াদের হাত দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে এমন আরো অজস্র শির্ক ও বিদ'আত। উপমহাদেশের মুসলিমদের কবর ও মাজার প্রীতি এবং বুজুর্গ-ওলীকে আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দেয়ার মতো শির্ক শিয়া ইনফ্লুয়েন্সেরই ফল। এদের হাত ধরে এসেছে আশুরা, মিলাদ মাহফিল, আখেরী চাহা সোম্বার মতো অনেক বিদ'আত।

এছাড়াও শিয়াদের ভেতর কোন দল সারাদিনে দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, কোন সেক্ট করে তিন ওয়াক্ত, কেউ কেউ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একসাথে একবারে আদায় করে। সালাতের ভেতর তারা হাত বাঁধে না এবং সালাতের সময় মাটিতে সরাসরি সিজদাহ না দিয়ে তারা কারবালা বা নাজাফের এক টুকরো মাটি সিজদাহর স্থানে রেখে সেখানে মাথা ঠেকায়। 'আত তাকিয়াহ'- মনের সত্য গোপনের ভয়াবহ বিশ্বাসঃ সবশেষে শিয়াদের সবচেয়ে বিধ্বংসী বিশ্বাসটি নিয়ে আলোচনা করবো যার নাম 'আত তাকিয়াহ'। আমাদের দেশে কিংবা পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন শিয়া বিশ্বাসীর সাথে কথা বললে তারা প্রথমেই যেটা করে যে, তাদের বিশ্বাসগুলো তারা এমনভাবে উপস্থাপন করে যে তারা সুন্নী বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি। তারা এমনকি সালাত আদায়ের সময় তাদের অনুসৃত আসল পদ্ধতি বাদ দিয়ে সুন্নীদের মতো করে সালাত আদায় করে, যাতে কেউ তাদের জানতে না পারে। একই কারণে তারা বারো ইমাম সম্পর্কে তাদের কুফর বিশ্বাস, কুরআন বিকৃতি নিয়ে তাদের বিশ্বাস এমন সব স্পর্শকাতর জিনিস গোপন রাখে। এই গোপন রাখাকে তারা তাদের ঈমান বা বিশ্বাসের অংশ বলে মনে করে যার নাম 'আত তাক্বিয়াহ'।

সুতরাং কোন শিয়া যখন অন্য মুসলিমদের কাছে তার বিশ্বাস সম্পর্কে বলবে, তখন সে সচেতনভাবেই মিথ্যা বলে নিজের মনের কথা গোপন করবে এবং এটা সে সৎকাজ হিসাবে জেনেই করবে।

http://www.schiiten.com/backup/Ahlel.../taqiyyah.html

আলোচনার শেষে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিসের উল্লেখ করে শেষ করতে চাই। এই হাদিসে দাজ্জাল প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দাজ্জালের অনুসারী হবে ইসফাহানের ৭০,০০০ ইয়াহুদী যারা পারস্যের চাদরে জড়ানো থাকবে"।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন দাজ্জালের অনুসারী ইয়াহুদীরা পারস্য বা পার্শিয়ান চাদরে মোড়ানো থাকবে। এই পার্শিয়া এখন শিয়ায়

পরিপূর্ণ। অনেক স্কলার বলেছেন দজ্জালের অনুসারী ইয়াহুদীদের সহযোগী এই পার্শিয়ান চাদর হলো শিয়ারা। ইয়াহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবাহর হাতে এই মতবাদের উদ্ভব হওয়া থেকে শুরু করে ইতিহাসের সকল পর্যায়ে ইয়াহুদীদের তাদের সখ্যতা ও উম্মাহর সাথে তাদের মুনাফেকী ও আত তাকিয়ার মতো ভয়াবহ বিশ্বাস আমাদের অবাক করে।

এতো খুবই সম্ভব, আল্লাহু আ'লিম। আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাই কোন সত্য পথের বাইরে যে কোন পথ থেকে, তার বাইরের খোলস যতই সুন্দর দেখাক না কেনো। সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহা'মদিকা আশহাদু আল্লাহ্* ইল্লা আন্তা ওয়াতুবু ইলাইহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৩৮৭

ইসলামী আইন ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

কালো পতাকা

Senior Member

০৪-২২-২০১৭

ইসলামী আইন ও গনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্ট্রা করা হলো।

*রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে বা প্রচলিত অন্য কোনো ব্যবস্থাপনাকে মেনে নেননি। নেওয়ার প্রশ্নই আসেনা, কারণ তিঁনি কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকে,এ্যারিষ্টটলের কাছ থেকে নয় বা রোমের বাদশাহের কাছ থেকে নয়।

*তাই ইসলামী রাজনিতী তে গনতন্ত্র মেনে নেয়া যায় না।

*গণতন্ত্রের জন্মদাতা হলেন এ্যরিষ্টটল এবং তিনি প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এ ব্যবস্থাপনা তৈরী করেছেন। এরপর তারই পথ ধরে যুগে যুগে গণতন্ত্রের অনেক প্রবক্তা এসেছেন এবং গণতন্ত্রের মূল সূত্র ঠিক রেখে তাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।
আমরা যদি গণতন্ত্র সম্পর্কে বলি –

আল-কোরআন ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যঃ

আল-কুরআনঃ “যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য|” [২:১৬৫]

গনতন্ত্রঃ জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস ।

আল-কুরআনঃ “আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।” [১২:৪০]

গনতন্ত্রঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগন, সংসদ, মন্ত্রী-এমপির (মদ, পতিতালয় বৈধও হতে পারে) ।

আল-কুরআনঃ আল্লাহ তাআলা সার্বভৌমত্বের মালিক। [৩:২৬]

গনতন্ত্রঃ সার্বভৌমত্বের মালিক জনগন।

আল-কুরআনঃ "(হে নবী) আপনি যদি অধিকাংশের রায়কে মেনে নেন তাহলে তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে|" [৬:১১৬]

গনতন্ত্রঃ অধিকাংশের রায়ই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

আল-কুরআনঃ "আল্লা'হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। " [২:২৭৫]

গনতন্ত্রঃ গণতন্ত্র সূদভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে।

আল-কুরআনঃ ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। [২৪:২]

গনতন্ত্রঃ সংসদ পতিতালয়ের (যিনা) লাইসেন্স দেয়।

আল-কুরআনঃ সৎকর্ম ও খোদা ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। [৫:২]

গনতন্ত্রঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজের সুনাম ও প্রতিদ্বন্দ্বীর কুৎসা রটায়।

আল-কুরআনঃ মদ, জুয়া, লটারী নিষিদ্ধ। [৫:৯০]

গনতন্ত্রঃ মদ এর লাইসেন্স দেয়। জুয়া, লটারী বৈধ।

আল-কুরআনঃ "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না।তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সেতাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। "

[৫:৫১]

গনতন্ত্রঃ কোন সমস্যা নাই। যার সাথে ইচ্ছা (আমেরিকা, ইসরাইল) বন্ধুত্ব কর।এখন সিদ্ধান্ত আপনাদের হাতে—- গনতন্ত্র গ্রহন করবেন নাকি ইসলাম ?

"যারা আমার আবতীর্ণকরা বিধান দ্বারা সমাজে বিধান দেয়না বা শাসনকাজ পরিচালনা করেনা , তারাই কাফির, ...তারাই জালিম, ...তারাই ফাসিক।"(সূরা মায়েদাহঃ ৪৪-৪৬)

সুতরাং যারা গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ পরিচালনা করছে তারা কাফির। আর যারা এই কাফিরদের উদ্ভাবিত সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি পরিচলনা করে, সুদ-প্রথা সমর্থন

করে, সুদ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তারাও কুফরী করছে। আর এই কাফিরদের যারা সমর্থন করে তাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে তাদের অনুকরণ এবং তাদের মত হওয়ার চেষ্টা করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।"(আবু দাউদ হাদীস নং ৪০৩১) তার অর্থ এটা দাড়ায় যে যারা বাংলাদেশে গনতন্ত্র চায় ও গনতান্ত্রিক নেতাদের সমর্থন করে তারাও তাদের অন্তর্গত।

আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি-জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ।-(সূরা হা-মীম সিজদাহঃ ২৭-২৮)

তোমরা কি ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষে বিশ্বাস কর ও অন্য অংশে অবিশ্বাস পোষণ কর? অতএব তোমাদের মধ্যের যারা এরকম করে তাদের ইহজীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী পুরস্কার আছে? আর কিয়ামতের দিনে তাদের ফেরত পাঠানো হবে কঠোরতম শাস্তিতে। আর তোমরা যা করছো আল্লাহ্ সে-বিষয়ে অজ্ঞাত নন।(সূরা বাকারাহ আয়াত ৮৫)

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর নিজেদের কোন ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"(সূরা আহযাব ৩৬)

তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে।এটিই হল মহা-অপমান।(সূরা তাওবাঃ৬৩)

*ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের যে সমস্ত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা হলো, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(১) "আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের মালিক,সার্বভৌমত্ব তারই।"(আল-কুরআন,৩৫:১৩)"অতএব পবীত্র ও মহান সে আল্লাহ,যিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি।"(আল-কুরআন,৩৬:৮৩)"তুমি কি

জাননা যে, আসমানসমূহ ও যমীনসমূহের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট,তিঁনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই, কোন সাহায্যকারী নেই ?"(আল-কুরআন,২ঃ১০৭)

কিন্তু গণতন্ত্রে বলা হয়েছে "সকল সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক জনগণ। "

(২) গণতন্ত্রে দলীয় শাসন থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি দলের লোকেরা শাসন করে। কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্রে বহু দলের উপস্থিতি থাকলেও, কোন দল শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবেনা, কারণ এতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা খুব বেশী এবং আমরা তা বর্তমান ব্যবস্থাপনায় দেখতে পাই। খলিফা (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান)বা জনগণের প্রতিনিধি কোন দলের লোক হলে তিনি দল ত্যাগ করে খলিফা হবেন। দলের সাথে তার কোন সংযোগ থাকবে না এবং তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যথেকে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন।

(৩) গণতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাসক ক্ষমতায় থাকে। কিন্তু ইসলামী খিলাফতে শাসক যতক্ষণ যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালিত করতে পারবেন ততক্ষণ থাকবেন,তিনি ব্যর্থ হলে ঐ মুহুর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে (খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং খলিফাকে নির্বাচিত করা যেমন ফর্জ তেমনিভাবে তিনি কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হলে তাকে হটিয়ে দেওয়াও ফর্জ দায়িত্ব,যা জনতা ইবাদত হিসেবে পালন করে।) ।

(৪) গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের মতামতে একটি আইন পাস হয় এবং তা যেকোন ব্যাপারেই হতে পারে। আইনসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য যদি বলে- মানুষ হত্যা করা উচিৎ তাহলে, তা আইনে পরিনত হবে (ইরাক,ফিলিস্থিন,লেবানন,আফগানিস্থানে নিরপরাধ মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর আগে আমেরিকা,ইসরাইল এবং সহযোগী অন্য দেশগুলোর আইনসভায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভিত্তিতে তা পাস হয় অর্থাৎ নিরপরাধ মানুষ মারার ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয়ভাবে জায়েজ করা হয়,এ ব্যাপারে আপনারা অবগত আছেন।)

কিন্তু ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত যদি ইসলামের সুস্পষ্ট আইনের বিরোধী হয় তাহলে তা কখনই গ্রহন যোগ্যতা পাবেনা। তবে এমন কোন ব্যাপার যদি হয়- যার সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই তবে সে সমস্ত ক্ষেত্রে সংখ্যা

গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "যারা আমার আবতীর্ণকরা বিধান দ্বারা সমাজে বিধান দেয়না বা শাসনকাজ পরিচালনা করেনা , তারাই কাফির, ...তারাই জালিম, ...তারাই ফাসিক।"(আল-কুরআন,৫ঃ৪৪-৪৬)

(৫) গণতন্ত্রে জনগণকে শাসন তত্বাবধানের দ্বায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জনগণের রায় নিয়ে যেই ক্ষমতায় যায়, সমস্ত ক্ষমতা তাদেরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত,পরিচালিত হয়,শাসন ক্ষমতার ৪/৫ বছরে জনগণের আসলেই কোন ক্ষমতা থাকেনা। শাসকগোষ্ঠী ভুল করলে বা জনস্বার্থ বিরুদ্ধ কাজ করলে তা সংশোধনের জন্য ৪/৫ বছর অপেক্ষা করতে হয় নির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি ভাল রায় দেওয়ার জন্য এবং সেটি মিস্ হলে বা জনগণ প্রতারিত হলে আবারও ৪/৫ বছর কপাল চাপড়াতে হয়।

কিন্তু ইসলামী খিলাফত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি বা খলিফা যে কোনো সময় ভুল করলে সমাজের যে কোন শ্রেণীর লোক সামনা সামনি খলিফার ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, কৈফিয়ৎ নিতে পারে, এমনকি তাকে কটাক্ষ করে কথা বললেও খলিফার কিছুই করার নেই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে রাগান্বিত হয়ে তিনি কিছুই করতে পারেন না। ভুল শুধরাতে ব্যর্থ হলে তাকে তাৎক্ষনিকভাবে বিদায় নিতে হয়।

(৬) গণতন্ত্রে নেতা নিজের চরিত্র সম্পর্কে উত্তম বয়ান করে তাকে ভোট দিতে বলেন এবং তিনি নেতৃত্বের যোগ্য বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় অন্য প্রার্থী তার থেকে কোন ক্রমেই ভালো নয় একথা নিশ্চয়তার সাথে প্রচার করেন ও প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে তার গীবত করেন। অনেক সময় তার বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ পেশ করেন এবং অন্যায়,কুটিল,অদ্ভুত চাল চালেন যাতে মানুষ তাকে ফেরেশতা এবং তার প্রতিপক্ষকে শয়তান মনে করে।

কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব চাইলেই- তিনি নেতৃত্ব দানে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন এবং তিনি বাদ পড়েন বা বিদায় হন। রসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেতৃত্ব দাবী করা লোকটিকে বাদ দিয়ে অন্যদের মধ্য থেকে নেতা খুঁজতে বলেছেন, কারণ নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কারনে সে নেতৃত্বের যোগ্যতা হারিয়েছে(একদা দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমাদেরকে আমাদের এলাকার শাসক মনোনিত করুন।

রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন,"আমরা এরুপ ব্যক্তিকে কোন পদে মনোনিত করি না,যে তার পদ চেয়ে নেয় বা পদের প্রতি লালায়িত হয়।"(বুখারী))। আর খলিফা নির্বাচনের পর যদি অন্য কেউ এসে বলে এ ব্যক্তি খলিফা হবার অযোগ্য,আমিই যোগ্য, আমাকে খলিফা বানানো হোক তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- এ লোকটিকে হত্যা কর। কারণ সে ফেত্না সৃষ্টি করতে চায়,ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা ভয়াবহ। আর খলিফার ব্যাপারটা এমন যে খলিফা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করেন।

কুরআন,সুন্নাহ,ইয্মা,ইজতিহাদ অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করেন। মৌলিক ক্ষেত্রে নিজের মতামত দিতে তিনি অক্ষম তাই আল্লাহর প্রতি অনুগত মানুষ তার কথায় দ্বিমত পোষণ করেনা বরং আল্লাহর ইবাদতের স্বার্থেই জনগণ খলিফার আদেশ,উপদেশ,নিষেধ মেনে চলে। এতে জনগনের ঐক্যে ফাটল ধরার সম্ভাবনা খুবই কম (রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন,'কোন ব্যক্তি যদি আমীরের (রাষ্ট্রের শাসক বা খলিফা)আনুগত্য ছিন্ন করে এক বিঘৎও দূরে সরে যায় এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ,তাহলে সেই মৃত্যু হবে তার জাহেলিয়াতের মৃত্যু।'-মুসলিম শরীফ) . খলিফা নির্বাচন নিয়ে অরাজকতা সৃষ্টির আশংকা কম, কারণ এত কঠিন দায়ীত্ব সাধারনতঃ কেউ নিতে চায় না। তাছাড়া এ দায়ীত্বের সাথে বৈষয়িক অনেক লোকসান জড়িত।

(৭) গণতন্ত্রে সরকারী দল – বিরোধী দল থাকে এবং তারা একে অন্যের প্রতিপক্ষ কিন্তু খিলাফতে বহু দলের অস্তিত্ব থাকলেও কোন দল সরকার গঠন করে না। প্রত্যেকটা দলের থেকে মানুষেরা তাদের নিজেদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য,ঈমানদার,আলিম বা উচ্চ শিক্ষিত,উত্তম চরিত্রবান,যেকোন পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন এক বা একাধিক জনকে খলিফা মনোনিত করতে পারেন এবং এরপর নির্বাচন কমিটির(নির্বাচন কমিটির সদস্যরা খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না) কাছে পাঠাবেন। যাকে মতোনিত করা হবে বা নির্বাচিত করা হবে তিনি নিজে এ পদ চাইতে পারবেন না,তবে মনোনিত করা হলে বিশেষ গুরুতর কারণ ছাড়া এ নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। খলিফা কোন দলের হলেও তিনি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। খলিফা হবার আগে দলত্যাগ করেন এবং তার কাছে তখন জাতি, ধমর্, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। এটি

খলিফার কাছে ফর্জ ইবাদত তাই প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় অবস্থাতে তার নীতি,প্রচেষ্টা কল্যানকর হবে।

(৮) গণতন্ত্রে শাসক এমন কতৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী হয় যাদেরকে(মানুষ) শাসক ফাঁকি দিতে পারে, আপোস রফা করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে শাসকের সুক্ষ্ম ফাঁকি ধরা সম্ভব হয়না, কারণ সে সীমাবদ্ধ জীব।

কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে শাসক স্রষ্টা আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী হয় আর আল্লাহ প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল অবস্থা অবগত। তিনি মানুষিকতা,বাহ্যিকতা,অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যত সবকিছুর হিসাব রাখেন।আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়,এটি খলিফা জানেন,মানেন, কারণ তিনি ঈমানদার। তিনি আল্লাহর নিকট কৈফিয়ৎ প্রদানে বিশ্বাসী।

(৯) গণতন্ত্র সমাজে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে- কুরআন ও সুন্নাহ যা পদ্ধতিগতভাবে পুঁজিবাদকে পুরোপুরি খতম করে।

(১০) গণতান্ত্রিক শাসনে সমাজে সরকারী দল ,বিরোধী দলের বিরোধ ছাড়াও উঁচু শেণী ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে সরকারী দল,বিরোধী দল থাকে না এবং ধনী ও দরীদ্রের বৈষম্য থাকে না।

(১১) গণতন্ত্রে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তন করে এতে ধনী হয় আরো ধনী,গরীব হয় আরো গরীব। এ ব্যবস্থায় গরীবের কাছ থেকে সম্পদ পদ্ধতিগতভাবে ধনীর হাতে গিয়ে আটকে থাকে।

খিলাফতে সম্পদ ধনী ও গবীবের মাঝে আবর্তন করে। ইসলামিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার কারনে ধনীরা গরীবের প্রাপ্য সম্পদ ফর্জ ইবাদত হিসেবে প্রদান করতে বাধ্য থাকে। কতিপয় ব্যক্তি কতৃক নয় বরং রাষ্ট্র কতৃক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় ,এতে সম্পদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল নাগরিকের কল্যান সাধন হয়।

(১২) গণতন্ত্রে জনগণের সম্পদ ব্যক্তি বা তাদের প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর ব্যক্তির বৈশিষ্ট হলো সে কখনই লোকসান করতে চায় না,যে ভাবেই

হোক না কেন সে লাভ করতে চায়। ফলে তাদের লাভের চিন্তা জনগণের অপরিসীম দুঃখ কষ্ট বয়ে আনে।

কিন্তু খিলাফতে খলিফা বা শাসক জনতার পক্ষ থেকে তাদের সম্পদের(পানি,বনভূমি,তেল,গ্যাস,কয়লা ইত্যাদি) সুষ্ঠ ব্যবহার করেন এবং সুষম বন্টন করেন। খিলাফত সরকার যদি হিসাব করে দেখে তারা জনগণকে সরকারী বিভিন্ন সুবিধা,সেবা বিনা মূল্যে প্রদান করতে পারছে,তবে খিলাফত সরকার জনগণকে সেগুলো ফ্রি দিয়ে থাকে। এ সরকার লাভের চিন্তা করে না বরং সেবার দিকটিই প্রাধান্য পায়। শাসক এ কাজটি ইবাদত হিসেবে করেন ফলে নিষ্ঠা,আন্তরিকতা,একাগ্রতার ছাপ থাকে প্রতিটি বৈধ কাজে।?

(১৩) গণতন্ত্রে কিছু পুঁজিপতি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা তাদের লাভের জন্যে কৃত্তিম সঙ্কট সৃষ্টি করে লাভবান হবার চেষ্টা করে। জনগণের ক্রয় ক্ষমতা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়,মুনাফাই বিবেচ্য। গণতন্ত্রে এটা বৈধ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে(পুঁজিবাদে) শাসকের কিছুই বলার নেই।

কিন্তু খিলাফতে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিরুপিত হয়,সরকার ব্যপক ভূর্তুকী দেয়। কতিপয় ব্যক্তি এখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সরকার এবং পণ্য দ্রব্য মজুদ করে কৃত্তিম সঙ্কট সৃষ্টিকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বন্দোবস্ত রয়েছে। তাছাড়া শাসক জনতাকে আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে সামাজিক,অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এখানে স্বতস্ফুর্ত।

(১৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনী, প্রভাবশালী শ্রেণী বেশী সম্পদশালী হবার কারনে এবং গরীবেরা পদ্ধতিগতভাবে বঞ্চিত হবার কারনে সমাজে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। বঞ্চিতরা ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের ক্ষোভের বহির্প্রকাশে ধনীরা অধিক পরিমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভূগতে থাকে,মধ্যবিত্তরাও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কিন্তু খিলাফত ব্যবস্থায় ধনী লোকেরা গরীবকে সম্পদের ভাগ দেওয়ার কারনে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে ফলে ধনীরা গরীব কতৃক ক্ষতির শিকার হয়না বরং তারাই তাকে নিরাপত্তা দিতে থাকে।

(১৫) গণতন্ত্র তৈরী হয়েছে ইসলাম বিরুদ্ধ চিন্তা চেতনা থেকে এবং এটি কুরআন,সুন্নাহ বহির্ভূত। কিন্তু ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ কতৃক মনোনিত এবং রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কতৃক অনুসৃত। গণতন্ত্র তৈরী হয়েছে সৃষ্ট জীব মানুষের চিন্তা,পরিকল্পনা থেকে অপরদিকে খিলাফত ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা থেকে।

“যখন তোমাদের ধনী শ্রেণী কৃপণ হবে, যখন তোমাদের যাবতীয় কাজে কর্তৃত্ব তোমাদের নারীদের হাতে চলে যাবে, তখন তোমাদের জন্য পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে অভ্যন্তর ভাগ অধিক কল্যাণকর হবে।” (তিরমিযী)

“হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। যখন নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো যে, (ইরানী) পারস্যের জনগণ কিসরার কন্যাকে (মেয়ে) তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনো সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যে জাতি স্বীয় কাজকর্মের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বভার একজন নারীর হাতে সোপর্দ করে।” (বুখারী ও তিরমিযী)

collected

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৩৭৭

জুলহাস মান্নানের জাহান্নাম যাত্রার ফলে যারা আনন্দিত হয়েছিলেন তাদের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক প্রতিবেদন

hadid_bd

Senior Member

০৪-২৭-২০১৭

অভিনব কৌশলে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় সমকামিতা ছড়িয়ে দিচ্ছে জুলহাস মান্নানের প্রভু ও সাঙ্গপাঙ্গরা

সারা বাংলাদেশব্যাপী সমকামীরা বিভিন্ন নাম দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশী এনজিওগুলো অর্থায়নে জেলায় জেলায় সমকামীদের ক্লাব খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সুসংগঠিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে যেসব ক্লাবের নাম দেখলেই বুঝবেন, এটা সমকামীদের সংগঠন-

১) লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম (বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এদের কার্যক্রম)

২) বন্ধু (সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

৩) ওডপাপ

৪) সাস (বরিশাল বিভাগে এদের কার্যক্রম)

৫) হাসাব

যে সকল এনজিও সমকামীদের স্বাস্থ্যগত সেবা দিয়ে থাকে-

১) আশার আলো সোসাইটি

২) মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ

৩) জাগরি

৪) ক্যাপ

যে সকল সংগঠন সমকামীদের আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে-

১) বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম (বিএমএসএফ)

২) আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

যে সকল বিদেশী সংস্থা বাংলাদেশের সমকামীদের অর্থায়ন করছে-

১) ফ্যামিলি হেলথ্ ইন্টারন্যাশনাল

২) রয়েল নেদারল্যান্ডস এ্যাম্বেসি

৩) ইউনাইটেড নেশন পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)

৪) 'হাতি' প্রকল্প, বিশ্বব্যাংক

৫) মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (mjf)

৬) আরসিসি প্রোজেক্ট অব দি গ্লোবাল ফান্ড আইসিডিডিআর,বি

সমকামী, 'গে' নামগুলো ব্যাপক বিতর্কিত হওয়ায় এরা নাম পরিবর্তন করেছে।

স্থানীয় পর্যায়ে এরা ব্যবহার করছে 'এমএসএম' নামটি।

এমএসএম অর্থ - মেল টু মেল সেক্স।

বাংলাদেশে সমকামীদের উস্কে দেওয়ার জন্য বিদেশী এনজিওগুলো কাজ শুরু করে প্রায় ২০ বছর আগে, ১৯৯৬ সালে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক জেলায় জেলায় এদের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এদেরকে দেখলে মনে হতে পারে এরা বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কাজ করছে, কিন্তু বাস্তবে সেরকম নয়।

এসব সংগঠনগুলো সমাজে প্রবেশ করতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করছে। যেমন

১) বিভিন্ন স্কুল-কলেছে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগীতামূলকঅনুষ্ঠান করা,

২) বিভিন্ন দিবসে ছাত্রদের দিয়ে র্যালী করানো।

৩) এইডস বিষয়ে সচেতন করা

৪) বিভিন্ন সভাসমাবেশ করা, এমনকি ধর্মীয় মাহফিলের আয়োজন করা।

৫) বিতর্ক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা।

৬) মাদক ও যৌতুক বিরোধী সভা করা

৭) উপজাতি গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে কাজ করা

৮) নাচগান, নাটকসহ ও বিনোদন অনুষ্ঠান করা

পুরুষ সমকামী বা এমএসএম'দের নিয়ে এরা দুভাবে কাজ করে।

১) ফিল্ড অফিস ভিত্তিক

২) ডিআইসি (ড্রপ ইন সেন্টার)। এদের বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক কার্যক্রম থাকে।

যেমন 'খুলনা ডিআইসি', 'টাঙ্গাইল ডিআইসি' ইত্যাদি।

প্রত্যেক অফিসের অনুকূলে কয়েকটি ক্রুজিং বা কর্ম এলাকা থাকে। এসব অফিসে জড়ো করে তাদের সমকামীতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়া বিনামূল্যে কনডম ও লুব্রিকেন্ট (পুরুষে পুরুষে যৌনকর্ম করতে পিচ্ছিল করতে পদার্থ) দেয়া হয়। প্রত্যেক অফিসে কনডম ডিপো স্থাপন করা আছে। এদের মানসিকভাবে শক্ত রাখতে নিয়মিত কাউন্সিলিং করা হয়। অনেকে হয়ত ভাবতে পারে, এ সংগঠনগুলো সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। আসলে ব্যাপারটা সে রকম নয়। এদের কাজগুলোকে ঠিক সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ বলা যায় না। মূলত এদের কাজ হচ্ছে সমাজে সমকামীতাকে ভাইরাল করা, অর্থাৎ পুরুষ পতিতা দিয়ে পুরুষ সমাজকে সমকামীতায় প্রলুব্দ করা, সমকামীতার বিস্তার ঘটানো।

আপনি হয়ত আরো ভাবতে পারেন, বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আসলে বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে নেই, অনেক দূর পর্যন্ত এরা শিকড় গেড়ে ফেলেছে।

'লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম', 'ডিআইসি' ইত্যাদি কি-ওয়ার্ড দিয়ে গুগলে সার্চ দিলে বুঝবেন, প্রত্যেক জেলায় জেলায় এরা কিভাবে ভাইরাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সমকামীতা বাংলাদেশের আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত হচ্ছে সরকারীকর্মকর্তাসহ নানান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। ফলে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ফুলে ফেপে ছড়িয়ে পড়ছে 'সমকামীতা' নামক জঘন্য বিষয়টি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৪৭০

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন-১

Ahmad Al-hindi

Member

০৪-২৩-২০১৭

কুফরে আমলীর ফেতনা মহামারী আকার ধারণ করেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনকি উলামাদেরও বিশাল অংশের আকীদা –

“কুফর শুধু আকীদা বিশ্বাসেরই নাম। আকীদা বিশ্বাস সঠিক থাকলে আমলের দ্বারা কেউ কাফের হয় না। আমলের কুফর বড় কুফর না। আমলের কুফর ছোট কুফর। একে কুফরে আমলী বলা হয়। আর কাফের হওয়ার জন্য কুফরে ই’তেকাদী তথা আকিদা বিশ্বাসগত কুফর প্রয়োজন।”

কুফরকে শুধু আকীদা বিশ্বাসের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া চরমপন্থী মুরজিয়াদের আকীদা। কিন্তু এই ইরজায়ী আকীদা আজ আহলে সুন্নত দাবিদারদের মাঝে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপকভাবে বলা হচ্ছে, **“আমল যতই খারাপ হোক, আকীদা বিশ্বাস সঠিক থাকলে আমলের দ্বারা কেউ কাফের হয় না।”**

এই গলদ আকীদার কারণে আজ অনেক মুরতাদকে মুরতাদ মনে করা হচ্ছে না। শত কুফরী করেও শুধু মুখে ঈমানের দাবির কারণে তারা আজ মুসলমান। কেউ তাদেরকে কাফের বললে তাকে তিরস্কার করা হয়-**‘তুমি কি তার বুক ফেঁড়ে দেখেছো তার দিলে ঈমান আছে কি নাই?’...** ইত্যাদী ইত্যাদী।

আজ যারা মুরতাদ শাসকদেরকে মুরতাদ বলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়েছেন তাদের বিরোধিতা চরমে উঠেছে। তাদেরকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, **তারা খারিজী, তারা তাকফিরী, তারা ওয়াহহাবী ... ইত্যাদী ইত্যাদী।**

যারা মনে করে কুফর শুধু আকীদা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে জিজ্ঞেস করি- কোন ব্যক্তি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করে তাহলে সে মুসলমান না মুরতাদ?

সাধারণত বলা হবে, সে মুরতাদ।

প্রশ্ন করি, সে মুরতাদ কেন?

উত্তরে যদি বলা হয়, 'কারণ সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করেছে'- তাহলে বলবো, উত্তর এমনটা হলে 'আকীদা বিশ্বাস ছাড়া কাফের হয় না' কথাটা দুরস্ত নয়। কারণ, এখানে তাকে কাফের বলা হচ্ছে তার কথা (অর্থাৎ কটুক্তির) কারণে; তার আকীদা বিশ্বাসের কারণে নয়। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তার আকীদা দুরস্ত থাকলেও শুধু এই কটুক্তির কারণেই সে মুরতাদ। তার আকীদা বিশ্বাস কি সেদিকে লক্ষ্য করা হবে না। যদি এমনটাই হয় তাহলে 'আকীদা বিশ্বাস ছাড়া কাফের হয় না' কথাটা আর দুরস্ত থাকছে না।

আর যদি বলা হয়, 'না। এখানে তাকে কাফের বলা হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তার বিরূপ আকীদার কারণ'; তাহলে জিজ্ঞেস করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে তার আকীদা বিরূপ তা কিভাবে বুঝলেন? তার বুক ফেঁড়ে দেখেছেন?

উত্তরে হয়তো বলবেন, 'তার কটুক্তি থেকেই বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তার আকীদা দুরস্ত নেই। যেহেতু আকীদা দুরস্ত নেই তাই কাফের।' অর্থাৎ সে কটুক্তির কারণে কাফের নয়, বিরূপ আকীদার কারণে কাফের। আর তার আকীদা খারাপ থাকার দলীল হচ্ছে তার কটুক্তি। যদি তার আকীদা দুরস্ত থাকতো তাহলে সে কটুক্তি করতো না।

উত্তর এমনটা হলে এখানে একটা আপত্তি আছে। আপনি বলতে চাচ্ছেন, আকীদা দুরস্ত থাকলে বাহ্যিকভাবে কুফরী কথা বলা সম্ভব নয়। জিজ্ঞেস করি ইয়াহুদীরা কাফের কেন? তারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য নবী তা জানতো না? অন্তর থেকে কি তারা তা মানতো না? এরপরও তারা মুখে তা অস্বীকার করলো কিভাবে? মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো কিভাবে?

যদি বলেন, 'না। তারা মুখে যেমন অস্বীকার করতো অন্তরেও তেমনি অবিশ্বাস পোষণ করতো'- তাহলে আপনি কুরআন বিরোধী কথা বলেছেন। কারণ, কুরআনে কারীমের স্থানে স্থানে বলা আছে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতো। এতদসত্বেও বাহ্যিকভাবে তাঁকে

সত্যায়ন করতো না। মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। অতএব, কুরআনে কারীমের এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট, অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস বজায় থাকা সত্ত্বেও কাফের হওয়া সম্ভব। শুধু সম্ভব যে তাই নয়; বরং কুরআনে কারীমের ভাষ্য মনে বিশাল এক জনগোষ্ঠী অন্তরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কাফের হয়ে আছে। অতএব, 'আকীদা বিশ্বাস ছাড়া কাফের হয় না' কথাটা কুরআনে কারীমের আলোকে আর দুরস্ত থাকছে না।

আচ্ছা, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি। কটুক্তিকারী যদি নিজে স্বীকার করে যে, অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তার আকীদা সম্পূর্ণ দুরস্ত। এতদসত্ত্বেও শুধু খাহেশাতের কারণে কটুক্তি করেছে- তাহলে তাকে কাফের বলা হবে কি'না?

যদি বলেন, 'বলা হবে'- তাহলে আপনাদের আকীদা 'আকীদা বিশ্বাস ছাড়া কাফের হয় না' দুরস্ত থাকছে না। কারণ, এখানে কটুক্তিকারী নিজে স্বীকার করছে যে, তার আকীদা দুরস্ত। এরপরও কটুক্তির কারণে তাকে কাফের বলা হচ্ছে। অতএব, অন্তরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কথায় কাজে কাফের হতে পারে।

আর যদি বলেন, 'না। তাকে কাফের বলা হবে না'- তাহলে প্রস্তুত থাকুন; অচিরেই হয়তো আপনাকে কাফের ফতোয়া দিয়ে শুলিতে ছড়ানো হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারীকে যে কাফের মনে করে না তাকে মুসলমান বলার অবকাশ নেই। ফিকহের কিতাবাদি খুলে দেখুন, আপনার ব্যাপারে এরকম বিধানই বর্ণিত আছে।

##########################
##########################

(চলবে ইনশাআল্লাহ!)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৪০২

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন-২

Ahmad Al-hindi

Member

০৪-২৫-২০১৭

ঈমান :

কুফরে আমলী'র আলোচনা বুঝার জন্য প্রথমে ঈমান ও কুফরের পরিচয় জেনে নেয়া জরুরী। ঈমান-কুফর সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে গেলে তখন কুফরে আমলী সহজেই বুঝে আসবে।

আমরা প্রথমে ঈমানের আলোচনা করব। সাথে অনুগামী হিসেবে কুফরের আলোচনাও আসবে।

 # ঈমানের আভিধানিক অর্থ-'বিশ্বাস করা', 'সত্যায়ন করা'। তবে সব ধরণের বিশ্বাস ও সত্যায়নকেই ঈমান বলা হয় না। ঈমান এক বিশেষ বিশ্বাস ও সত্যায়নের নাম। আর তা হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যায়ন করা এবং মনে প্রাণে সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়া।

তবে শুধু আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়নকেই ঈমান বলা হয় না। ঈমানের জন্য আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়নের পাশাপাশি আরো দু'টো বিষয় আবশ্যক।

এক. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়নের মৌখিক স্বীকারোক্তি।

দুই. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়ন বিরোধি কোন কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া।

অতএব, ঈমান তিন জিনিসের সমষ্টির নাম:

এক. আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন।

দুই. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়নের মৌখিক স্বীকারোক্তি।

তিন. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়ন বিরোধি কোন কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

এক. আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন:

আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, নবুওয়্যাত, আখেরাত, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদী সহ দ্বীনের এমন সকল বিষয়াশয়, বিধিবিধান ও খবরাখবরের উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মনে প্রাণে সেগুলো মেনে নেয়া, যেগুলো সুস্পষ্টভাবে অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বীনের প্রত্যেকটা বিষয়কে জেনে তারপর তাতে বিশ্বাস স্থাপন জরুরী নয়; বরং এজমালীভাবে এই বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে প্রমাণিত সে সবই সত্য এবং বাস্তব। কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ও দ্বিধা-আপত্তি ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল বিষয়ে সত্যায়ন করা এবং মনে প্রাণে সেসব বিষয় মেনে নেয়াই যথেষ্ট। একেই 'তাসদিকে কলবী'-'আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন' বলা হয়।

দুই. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়নের মৌখিক স্বীকারোক্তি:

উপরোক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়নই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়,পাশাপাশি এর মৌখিক স্বীকারোক্তিও জরুরী।

মৌখিক স্বীকারোক্তি কি ঈমানের রুকন তথা মৌলিক অংশ না'কি তা ঈমানের জন্য শর্ত স্বরূপ এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে সকলেই একমত যে, কারো কাছে উপরোক্ত স্বীকারোক্তি চাওয়ার পরও যদি সে স্বীকারোক্তি না দেয়, তাহলে সে মুমিন বলে গণ্য হবে না। দুনিয়াবী হুকুমেও না, আল্লাহ তাআলার কাছেও না। **তবে কয়েক ব্যক্তির হুকুম এ থেকে ভিন্ন।**

এক. স্বীকারোক্তি দিতে যে অক্ষম। যেমন, বোবা। তার আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়নই তার ঈমানের জন্য যথেষ্ট। যেহেতু সে মৌখিক স্বীকারোক্তি দিতে সক্ষম নয়।

দুই. যে স্বীকারোক্তি দেয়ার সুযোগ পায়নি। যেমন, আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও সত্যায়নের পরপরই মৃত্যু বরণ করলো কিংবা তাকে শহীদ করে দেয়া হলো।

তিন. মুকরাহ। অর্থাৎ যার প্রবল ধারণা হচ্ছে যে, ঈমানের স্বীকারোক্তি দিলেই তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। তখন জীবন বাঁচানোর স্বার্থে যদি ঈমানের স্বীকারোক্তি না দেয় আর তার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান বজায় থাকে, তাহলে মুমিন বলেই গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে উত্তম হলো ঈমানের স্বীকারোক্তি দিয়ে শহীদ হয়ে যাওয়া। কুফরী কথা উচ্চারণ করার চেয়ে ঈমানের উপর অটল অবিচল থেকে জীবন দিয়ে দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রিয়।

এই তিন প্রকার ব্যক্তি মৌখিক স্বীকারোক্তি ছাড়াই শুধু আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়নের মাধ্যমেই ঈমানদার বলে গণ্য হবে।

তিন. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়ন বিরোধি কোন কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া:

ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য শুধু আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন এবং তার মৌখিক স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি এমন সকল কথা ও কাজ থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক যা উপরোক্ত সত্যায়ন ও স্বীকারোক্তির পরিপন্থি। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে সকল কিছু বিশ্বাস ও সত্যায়ন করে এবং মুখে তার স্বীকারোক্তিও দেয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় এমন কোন কথা বা কাজে লিপ্ত হয় যা উপরোক্ত বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির সাথে সাংঘর্ষিক- তাহলে সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। দুনিয়াবী হুকুমেও না, আল্লাহ তাআলার কাছেও না। দুনিয়াতেও সে কাফের বলে গণ্য হবে, আখেরাতেও চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক কয়েকটি কর্ম:

১. মূর্তিকে সাজদা করা।

২. কোন নবীকে হত্যা করা কিংবা অবমাননা করা।

৩. কুরআনে কারীমের অবমাননা করা।

৪. কা'বা শরীফের অবমাননা করা।

৫. স্বেচ্ছায় কোন কুফরী কথা বলা ... ইত্যাদী।

কোন ব্যক্তির অন্তরে যদি পরিপূর্ণ ঈমানও বজায় থাকে এবং মুখে পরিপূর্ণ স্বীকারোক্তিও দেয়; কিন্তু সে এসবের কোন একটাতে বা এ জাতীয় ঈমান বিধ্বংসী

অন্য কোন কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। দুনিয়াবী হুকুমেও না, আল্লাহ তাআলার কাছেও না। দুনিয়াতেও সে কাফের বলে গণ্য হবে, আখেরাতেও চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল কুফর তিনভাবে হতে পারে:

এক. কোন কুফরী আকীদা-বিশ্বাস পোষণের দ্বারা।

দুই. কোন কুফরী কথা বলার দ্বারা।

তিন. কোন কুফরী কর্মে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা।

এই তিনপ্রকার কুফরীর তিনটাই কারো মাঝে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, কেউ অন্তরে কুফরী আকীদা পোষণের পাশাপাশি মুখে কুফরী কথাও বললো আবার কুফরী কাজেও লিপ্ত হল। আবার কারো মাঝে দুইটা আবার কারো মাঝে একটাও পাওয়া যেতে পারে। তবে কাফের হওয়ার জন্য একটা কুফরী পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। চাই তা আকীদাগত হোক, বা কথায় বা কাজে হোক। অতএব, কুফরকে শুধু আকীদা বিশ্বাসের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থি।

দলীল প্রমাণ সামনের পর্ব থেকে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৪৩৯

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৩

Ahmad Al-hindi

Member

০৫-০৬-২০১৭

পূর্বোক্ত আলোচনার পর এবার ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। সাথে প্রাসঙ্গিক হিসেবে আরো অনেক বিষয় আসবে।

প্রথমে **'ফাতাওয়া শামী'**র **'বাবুল মুরতাদ'** থেকে কিছু নির্বাচিত বক্তব্য উল্লেখ করবো। সাথে সাথে সেগুলো থেকে নির্গত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফায়েদার উপরও আলোকপাত করবো। বক্তব্যগুলো বুঝার সুবিধার্থে তরজমার ফাঁকে ফাঁকে আমার নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা যোগ করবো। সেগুলো থার্ড ব্র্যাকেট [] এ দেয়া হবে। ওয়াল্লাহু তাআলাল মুওয়াফফিক!

বক্তব্য- ১:

وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل.اهـ

"(মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. তাঁর কিতাব) 'আল-মুসায়ারাহ্' তে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, ঈমানের জন্য অবমাননা বুঝায় মতো কোন ক্বওল বা ফে'ল-কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক।" (ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৫)

ফায়েদা:

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য এমন কোন কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া আবশ্যক যা আল্লাহ, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, দ্বীন বা অকাট্য কোন দ্বীনী বিষয়ের শানের অবমাননা বুঝায়। অতএব, আন্তরিক বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও যদি এমন কোন কথা বা কাজ পাওয়া যায় যা আল্লাহ, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, দ্বীন বা অকাট্য কোন দ্বীনী বিষয়ের শানের অবমাননা বুঝায় তাহলে সে আর মু'মিন থাকবে না, মুরতাদ হয়ে যাবে।

এখান থেকে আরোও বুঝা গেল, কুফর শুধু আকীদা বিশ্বাসের নাম নয়। আকীদা বিশ্বাসের দ্বারা যেমন কাফের হয়, কুফরী কথা ও কাজের দ্বারাও তেমনি কাফের হয়ে যায়।

বক্তব্য- ২:

)قوله من هزل بلفظ كفر) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه ، وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار لأن التصديق ، وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور ، وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر ، وإن كان مصدقا لأن ذلك في حكم التكذيب.اهـ

"যে ব্যক্তি হাসি তামাশায় কোন কুফরী কথা বললো সে কাফের হয়ে গেল। 'হাসি তামাশায় বললো' বলতে কথাটা বলেছে ইচ্ছাকৃতভাবেই তবে এর অর্থ সে উদ্দেশ্য নেয়নি। উপরে যে বর্ণিত হয়েছে, ঈমান শুধু তাসদীক-আন্তরিক বিশ্বাস কিংবা আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম- এর সাথে এই মাসআলার কোন বিরোধ নেই। [অর্থাৎ এ প্রশ্ন হবে না যে, যে ব্যক্তি হাসি তামাশায় কোন কুফরী কথা বললো সে তো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস পোষণ করছে এবং মৌখিকভাবে সবকিছুর স্বীকারোক্তিও দিচ্ছে, আর হাসি তামাশায় যে কুফরী কথা বলেছে এর অর্থ তো সে উদ্দেশ্য নিচ্ছে না, শুধু হাস্যরসে কথাটা বলেছে, তাহলে সে কাফের হবে কেন? তার তো আন্তরিক বিশ্বাসও ঠিক আছে, মৌখিক স্বীকারোক্তিও ঠিক আছে, তাহলে সে কাফের হবে কেন- এ আপত্তি এখানে উঠানো যাবে না।]

কেননা, বাস্তবে তাসদীক-আন্তরিক বিশ্বাস বিদ্যমান থাকলেও বিধানগত দিক থেকে তা নেই বলে ধর্তব্য। কেননা, শারে'-শরীয়তদাতা কোন কোন গুনাহকে তাসদীক-আন্তরিক বিশ্বাস না থাকার আলামত নির্ধারণ করেছেন। যেমন – হাসি তামাশায় কুফরী কথা বলা যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ যদি মূর্তিকে সাজদা করে কিংবা কুরআনে কারীমকে ময়লায় নিক্ষেপ করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যদি সে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসীও হয় তবুও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, এই ধরণের কর্মকাণ্ড বিধানগতভাবে [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সমার্থক। " (ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৬)

ফায়েদা:

এখান থেকে বুঝা গেল,

হাসি তামাশায় কুফরী কথা বললেও কাফের হয়ে যায়। কুফরী কথা দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য না নিলেও, শুধু এমনি এমনি বললেও তাতে কাফের হওয়ার মাঝে কোন তফাৎ সৃষ্টি হয় না।

কাফের হওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত কুফরী কথা বলা কিংবা ইচ্ছাকৃত কোন কুফরীকর্মে লিপ্ত হওয়াই যথেষ্ট। উক্ত কথা বা কর্ম যে কুফর সে তা জানে কি'না বা সে এর দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য নিয়েছে কি'না ইত্যাদী কোন কিছুই দেখা হবে না। কাজটা কুফরী কাজ হওয়া কিংবা কথাটা কুফরী কথা হওয়া এবং সে তাতে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হওয়াই কুফরের জন্য যথেষ্ট। তার আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি, জীবনভর নেক আমল- কোন কিছুই তাকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারবে না।

মূর্তিকে সাজদা করা কিংবা কুরআনে কারীমকে ময়লায় নিক্ষেপ করা কুফরে আকবার যদিও তা কুফরে আমলী। অর্থাৎ এমন কুফর যা আকীদার সাথেও সম্পৃক্ত নয়, কোন কথার সাথেও নয়; বরং তা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত একটা আমল। অতএব, কুফরে আমলী মানেই ছোট কুফর- কথাটা ভিত্তিহীন। বরং এসব কুফরে আমলী সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মতই কুফর।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬২৬

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৪

Ahmad Al-hindi

Member

০৫-০৬-২০১৭

বক্তব্য-৩:

قال في المسايرة : وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب ، أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا ، كترك السجود لصنم ، وقتل نبي والاستخفاف به ، وبالمصحف والكعبة . وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود ، ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان فهو حينئذ التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر بدليل أن بعض هذه الأمور ، تكون مع تحقق التصديق والإقرار ، ثم قال ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة ، و أفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا ...أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه ا هـ . قلت : ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به ، وإن لم يقصد الاستخفاف لأنه لو توقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مر لأن قصد الاستخفاف مناف للتصديق.اهـ

“‘আল-মুসায়ারাহ্’তে (ইবনুল হুমাম রহ.) বলেন, {ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাসদীক বিল-ক্বলব তথা আন্তরিক বিশ্বাস কিংবা আন্তরিক বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকারোক্তির সাথে আরো কতিপয় বিষয়কে মিলানো হয়েছে, যেগুলোর কোন একটাতে ত্রুটি করা সর্বসম্মতিক্রমে ঈমান বিনষ্ট করণ বলে ধর্তব্য। যেমন- মূর্তিকে সাজদা না করা, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা না করা, কুরআনে কারীম বা কা’বা শরীফের শানের অবমাননা না করা। তদ্রূপ মুজমা’ আলাইহি-সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়ের বিরোধিতা বা অস্বীকারও ঈমান বিধ্বংসী।

কেননা, এসব বিষয় আন্তরিক বিশ্বাস না থাকার দলীল।} অত:পর তিনি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, এসব বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি না করা ঈমানের একটি মৌলিক অংশ। [যেমন আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের মৌলিক অংশ।] অতএব, ঈমান হচ্ছে [তিন জিনিসের সমষ্টির নাম। যথা:] তাসদীক- আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলোতে কোনরূপ ত্রুটি না করা। [অর্থাৎমূর্তিকে সাজদা না করা, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা না করা, কুরআনে কারীম বা কা'বা শরীফের শানের অবমাননা না করা। তদ্রূপ মুজমা' আলাইহি-সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়ের বিরোধিতা বা অস্বীকার না করা।] এর দলীল- আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও এসব বিষয়ের কোন কোনটা পাওয়া যায়। [অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কেউ মূর্তিকে সাজদা করতে পারে, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা করতে পারে, কুরআনে কারীম বা কা'বা শরীফের শানের অবমাননা করতে পারে। আর এসব বিষয় কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে দেখা গেল, আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কাফের হয়ে যাচ্ছে। আর তা এসব বিষয়ের কোন একটাতে লিপ্ত হওয়ার কারণে। কাজেই বুঝা গেল, শুধু আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলোর সাথে সাথে এসব বিষয়ের কোন একটাতে লিপ্ত না হওয়াও অত্যাবশ্যক। অতএব, আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি যেমন ঈমানের মৌলিক অংশ, এসব ঈমান বিধ্বংসী বিষয় থেকে বেঁচে থাকাও ঈমানের মৌলিক অংশ।]

{(ইবনুল হুমাম রহ.) এরপর বলেন, ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য তা'জীমকে শর্ত করার কারণে যেটি অবমাননার বিপরীত, হানাফিরা তা'জীম বিনষ্টকারীদের থেকে প্রকাশিত অনেক কথা ও কাজের দ্বারা তাকফীর করে থাকেন। কেননা, সেগুলো দ্বীনের অবমাননা বুঝায়। যেমন, ইচ্ছাকৃত অযু ছাড়া নামায পড়া ; ... কিংবা কোন সুন্নতকে অপছন্দ করা; যেমন- কেউ তার পাগড়ির একাংশ গলার নিচে রাখে আর অন্য একজন তা অপছন্দ করলো, কিংবা কারো গোফ খাটো রাখাকে কেউ অপছন্দ করলো।} 'আল-মুসায়ারাহ্'র বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হল।

আমি বলি [অর্থাৎ আল্লামা শামী রহ. বলেন], উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, যা কিছুই [দ্বীনের] অবমাননা বুঝায় তার দ্বারাই তাকফীর করা হবে, যদিও অবমাননা করা তার উদ্দেশ্য না হয়। কেননা, অবমাননা উদ্দেশ্য নেয়ার উপর যদি তাকফীর মাওকূফ থাকতো তবে [ঈমানের মৌলিক অংশ হিসেবে] পূর্বালোচিত বিষয়গুলোর কোনটাতে লিপ্ত না হওয়াকে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়তো না। কেননা, অবমাননার ইচ্ছা করা তো সরাসরি আন্তরিক বিশ্বাস বিরোধি কাজ।" (ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৬)

অর্থাৎ মূর্তিকে সাজদা করা, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা করা, কুরআনে কারীম বা কা'বা শরীফের শানের অবমাননা করা ... ইত্যাদী দ্বীনের অবমাননাকর যাবতীয় কাজ স্বয়ং নিজেরাই কুফর। এগুলোতে যে লিপ্ত হবে সে কাফের, চাই সে তা দ্বীনের অবমাননার উদ্দেশ্যে করুক বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে করুক। অবমাননা উদ্দেশ্য নিয়েছে কি নেয়নি সেটা দেখার বিষয় নয়। কারণ, দ্বীনের অবমাননাকর এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক অংশ, যেমন আন্তরিক বিশ্বাস একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক অংশ। এগুলো থেকে বিরত থেকে আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ না করলে যেমন ঈমানদার হয় না, আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করার পর এগুলো থেকে বিরত না থাকলে তেমনি ঈমানদার হবে না। কেননা, ঈমানের জন্য উভয়টাই অত্যাবশ্যক। কাজেই যে ব্যক্তি দ্বীনের অবমাননাকর কোন কাজে লিপ্ত হবে সে কাফের হওয়ার জন্য তার এ লিপ্ত হওয়াই যথেষ্ট। লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আবার দ্বীনের অবমাননা করার ইচ্ছা থাকাও শর্ত নয়।

বিষয়টাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলি। এখানে দু'টো বিষয়:

১. দ্বীনের অবমাননার ইচ্ছা করা।

২. দ্বীনের অবমাননা বুঝায় মতো কোন কাজে লিপ্ত হওয়া।

দ্বীনের অবমাননার ইচ্ছা করা সরাসরি আন্তরিক বিশ্বাস বিরোধি একটা কুফরী কাজ। এটি পাওয়া গেলে তার কাফের হওয়ার জন্য আর কিছু লাগবে না। সে যদি অবমাননার ইচ্ছা করার পর অবমাননাকর কোন কাজে লিপ্ত নাও হয় তবুও কাফের।

আর দ্বীনের অবমাননা বুঝায় মতো কোন কাজে লিপ্ত হওয়া দুই কারণে হতে

পারে:

১. দ্বীনের অবমাননার উদ্দেশ্যে।

এটা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বরং এখানে দু'টা কুফর পাওয়া গেল: এক. অবমাননার ইচ্ছা। দুই. অবমাননাকর কাজ।

২. অবমাননার ইচ্ছা ছাড়াই শুধু খাহেশাত বা স্বার্থের কারণে।

এটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ কুফর। এর সাথে যদি অবমাননার ইচ্ছাকে শর্ত করে দেয়া হয়, তাহলে 'অবমাননাকর কাজ থেকে বিরত থাকা'টা আর ঈমানের স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌলিক অংশ থাকছে না। কারণ, কোন বস্তুর মৌলিক অংশ বলতে তাকেই বুঝায় যা না পাওয়া গেলে ঐ বস্তু অস্তিত্বেই আসবে না। ' সব ধরণের অবমাননাকর কাজ থেকে বিরত থাকা' যেহেতু ঈমানের একটা মৌলিক অংশ কাজেই সেটা না পাওয়া গেলে আর ঈমানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আর অবমাননাকর কাজে লিপ্ত হওয়াকে কুফর সাব্যস্ত না করে যদি তার সাথে অবমাননার ইচ্ছাকেও শর্ত হিসেবে যোগ করা হয়, তাহলে 'অবমাননাকর কাজ থেকে বিরত থাকা'টা ঈমানের মৌলিক অংশ হিসেবে থাকছে না। কারণ অবমাননার ইচ্ছাকেও শর্ত করার অর্থ- অবমাননাকর কাজে লিপ্ত ব্যক্তি যদি তাতে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা অবমাননার ইচ্ছা না করে তাহলে সে মুসলমানই থেকে যাবে। কাফের হবে না। তাহলে তখন অবমাননাকর কাজে লিপ্ত হওয়ার পরও ঈমান যাবে না। যদি 'অবমাননাকর কাজ থেকে বিরত থাকা'টা ঈমানের মৌলিক অংশ হয় তাহলে অবমাননাকর কাজে লিপ্ত হওয়ার পর আর ঈমান বাকি থাকবে না। যেহেতু 'অবমাননাকর কাজ থেকে বিরত থাকা' ঈমানের মৌলিক অংশ হিসেবে আইম্মায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত কাজেই কোন একটা অবমাননাকর কাজে লিপ্ত হওয়াই ঈমান বিধ্বংসী ও কুফর। তার সাথে অবমাননার ইচ্ছা থাকা শর্ত নয়। অতএব, অবমাননাকর কাজে লিপ্ত হওয়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ কুফর, চাই সাথে অবমাননার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক।

একটা জরুরী ব্যাখ্যা: আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়নের পাশাপাশি মৌখিক স্বীকারোক্তিও ঈমানের মৌলিক অংশ কি'না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে মৌলিক অংশ, কারো মতে মৌলিক অংশ নয় বরং শর্ত। তবে এ উভয় শ্রেণীই একমত যে, 'দ্বীনের অবমাননাকর সব ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকা' ঈমানের জন্য অত্যাবশ্যক। বক্তব্যের শুরুতে মুসায়ারাহ্'র বক্তব্যে এ দিকেই ইঙ্গিত করা

হয়েছে।

ফায়েদা: উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা গেল,

১. শুধু আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়নকেই ঈমান বলা হয় না। ঈমানের জন্য আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়নের পাশাপাশি আরো দু'টো বিষয় আবশ্যক।

এক. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়নের মৌখিক স্বীকারোক্তি।

দুই. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়ন বিরোধি কোন কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন কোন কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া যা দ্বীনের জন্য অবমাননাকর।

অতএব, ঈমান তিন জিনিসের সমষ্টির নাম:

এক. আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন।

দুই. উক্ত বিশ্বাস ও সত্যায়নের মৌখিক স্বীকারোক্তি।

তিন. 'দ্বীনের অবমাননাকর সব ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকা'

২. কাফের হওয়ার জন্য আকীদা বিশ্বাসে কুফর পোষণ করা বা মুখে তার স্বীকারোক্তি দেয়া জরুরী নয়। বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি সহীহ সালেম থাকার পরও শুধু বাহ্যিক আমলের কারণে কাফের হতে পারে। যেমন- মূর্তিকে সাজদা করলে, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা করলে, কুরআনে কারীম বা কা'বা শরীফের শানের অবমাননা করলে কিংবা এ জাতীয় অন্যকোন দ্বীনের অবমাননাকর কাজ করলে মুরতাদ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আকীদা বিশ্বাস বা মৌখিক স্বীকারোক্তির দিকে বা তার অন্যান্য নেক আমলের দিকে কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

৩. অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোন সুন্নতকে অপছন্দ করলে কাফের হয়ে যাবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৩২

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৫

Ahmad Al-hindi

Member

০৫-০৭-২০১৭

বক্তব্য-৪:

(قوله تكذيبه ﷺ إلخ) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر أي عدم الإذعان والقبول ، لما علم مجيئه به ﷺ ضرورة ، أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال ، وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا لأن مجرد نسبة الكذب إليه ﷺ كفر وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط ، مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا ، بل قد يكون استخفافا من قول أو فعل كما مر ا هـ

"কুফর হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা দ্বারা উদ্দেশ্য তাসদীক-সত্যায়ন না করা যেটির আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ এমন কোন বিষয়কে মেনে না নেয়া এবং কবুল না করা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন বলে এতই সুস্পষ্ট-সর্বজন বিদিত যে, তার আর দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সুস্পষ্টভাবে বলবে, তিনি অমুক বিষয়ে মিথ্যাবাদি। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে কোনরূপ মিথ্যার সম্পর্ক করাটাই কুফর। [অর্থাৎ যে বলবে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যাবাদি'- সে এতটুকুর দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে শরীয়তের কোন বিষয়কে অস্বীকার না করে এবং যদিও অন্যকোন কুফর তার মাঝে না পাওয়া যায়।] বাহ্যিকভাবে তাঁর [অর্থাৎ হাছকাফী রহ. এর] বক্তব্য থেকে বুঝে আসে, কুফর শুধু জরুরী বিষয়কে অস্বীকার করার মাঝেই সীমবদ্ধ। কিন্তু [বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়] আমাদের [হানাফিদের] নিকট শুধু অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া শর্ত, যদিও তা জরুরী বিষয় না হয়। বরং অনেক সময় শুধু অবমাননাকর কথা বা কাজই কুফর হয়, যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। " (ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৬-৩৫৭)

‘জরুরী বিষয়’ ও ‘অকাট্য বিষয়’- এর ব্যবধান:

জরুরী বিষয় বলতে পূর্বে যা বলা হয়েছে যে, এমন সব বিষয় যেগুলো এতই সুস্পষ্ট-সর্বজন বিদিত যে, তার আর দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, মদ, যিনা...ইত্যাদী যেগুলো শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল দ্বীনদার মুসলমানেরই জানা থাকে। আর যেসব বিষয় অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত তবে নামায রোযার মত এত সুস্পষ্ট নয়, সেগুলোকে ‘জরুরী বিষয়’ বলে না বরং ‘অকাট্য বিষয়’ বলে। অতএব, সব জরুরী বিষয়ই অকাট্য বিষয়, কিন্তু সব অকাট্য বিষয়ই জরুরী বিষয় নয়।

কোন জরুরী বিষয়কে অস্বীকার করলে সাথে সাথে কাফের হয়ে গেছে বলে হুকুম লাগানো হবে। আর কোন অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করলে সাথে সাথেই কাফের হয়ে গেছে বলে হুকুম লাগানো হবে না। দেখতে হবে, বিষয়টা যে অকাট্য তা সে জানে কি’না। যদি জানা শুনা থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার করে তাহলে কাফের হয়ে গেছে বলে হুকুম লাগানো হবে। আর যদি জানা না থাকে তাহলে সাথে সাথে কুফরের হুকুম লাগানো হবে না। প্রথমে উলামায়ে কেরাম তাকে জানাবে যে, বিষয়টা শরীয়তের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এরপরও যদি অস্বীকারের উপরই বহাল থাকে তাহলে কাফের হয়ে গেছে বলে হুকুম লাগানো হবে। (দেখুন: ফাতাওয়া শামী, ৬: ৩৫৭)

ফায়েদা:

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল,

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে কাফের হয়ে যায়। মিথ্যা প্রতিপন্ন বলতে তিনি নবীই নন বা তাঁর আনীত ধর্ম সত্য নয় ... ইত্যাদী বলা আবশ্যক নয়। তাঁর আনীত যেকোন একটা বিষয়কে অস্বীকার করাই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল। কারণ, তাঁর আনীত কোন বিষয়কে অস্বীকার করার অর্থ একথা বলা যে, উক্ত বিষয়ে তিনি মিথ্যা বলেছেন। এতটুকুই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুখে সরাসরি তাঁকে মিথ্যাবাদি বলা আবশ্যক নয়।

২. দ্বীনের কোন জরুরী বিষয়কে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, কোন অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যায়। তবে এ দু'টোর মাঝে কিছুটা পার্থক্য আছে যেমনটা উপরে বলা হয়েছে।

৩. দ্বীনের অবমাননাকর কোন কথা বা কাজ কুফর।

ফাতাওয়া শামীর উল্লেখিত বক্তব্যসমূহ থেকে আশাকরি আর অস্পষ্ট নেই যে, কুফর শুধু আকীদা বিশ্বাসের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। পূর্ণ আন্তরিক বিশ্বাস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এবং সকল বিষয়ের মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান সত্ত্বেও কুফরে আমলী তথা কুফরী কথা ও কাজের কারণে মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। কাজেই 'কুফরে আমলী ছোট কুফর, কুফরে আমলী দ্বারা মুরতাদ হয় না' বলে যে আকীদা বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তা একান্তই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমাদের ঈমান আমল হেফাজত করুন। আমীন!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৪৩

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৬

Ahmad Al-hindi

Member

০৫-০৭-২০১৭

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. এর বরাতে একটি ব্যাপক প্রচলিত সংশয়ের অপনোদন:

আমাদের সমাজে একটি সংশয় ব্যাপক প্রচলিত। কি উলামা কি জনসাধারণ সবার মাঝেই ব্যাপকভাবে তা প্রচলিত। সেটি হলো, তারা মনে করেন, যার যাহের কুফর তার বাতেনও কুফর। অর্থাৎ যাহিরিভাবে যে ব্যক্তি কোন কুফরী কাজে লিপ্ত হলো সে বাতেনিভাবেও কুফরের শিকার। তার বাতেনে কুফর রয়েছে বলেই সে যাহেরিভাবে কুফরে লিপ্ত হতে পেরেছে। আসলে যদি তার দিলে ঈমান থাকতো তাহলে সে কুফরিতে লিপ্ত হতো না। বাহ্যিকভাবে কুফরে কেবল সে ব্যক্তিই লিপ্ত হতে পারে যে তার অন্তরে কুফর পোষণ করে। অন্তরে ঈমান থাকলে বাহ্যিকভাবে কুফরী করা সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করে তাহলে তারা মনে করেন, ঐ ব্যক্তি অন্তরে অন্তরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করে। যদি সে অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস রাখতো তবে বাহ্যিকভাবে তাঁকে নিয়ে কটুক্তি করতো না।

তদ্রূপ, যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমের অবমাননা করল, তারা মনে করেন, আসলে সে কুরআনে বিশ্বাসী নয়। যদি সে কুরআনে বিশ্বাসী হতো তাহলে বাহ্যিকভাবে সে কুরআনের অবমাননা করতে পারতো না।

মোটকথা, তাদের মতে বাহ্যিক কুফর আর অন্তরের বিশ্বাস একত্র হতে পারে না। বাহ্যিকভাবে যে কুফরে লিপ্ত আকীদা বিশ্বাসেও সে অবিশ্বাসী, কাফের। এই আকীদার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, কুফর শুধু আকীদার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর বাহ্যিক কুফরী কথা-কাজ আভ্যন্তরিণ কুফরীর আলামত সাব্যস্ত হয়।

দলীল:

কেউ কেউ তাদের এ আকীদার পক্ষে দলীল পেশ করে যে, শরীয়ত যাকে কাফের বলে সে যদি বাস্তবিকই কাফের না হতো তাহলে শরীয়ত তাকে কাফের বলতো না এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী সাব্যস্ত করতো না। অর্থাৎ কুফরী কথা বা কাজের কারণে শরীয়ত যাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে সে যদি আভ্যন্তরিণ আকীদা বিশ্বাসেও কাফের না হতো তাহলে শরীয়ত তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করতো না। তার অন্তরে যদি ঈমান থাকতো তাহলে শরীয়ত তাকে কাফের বলতো না। অতএব, শরীয়তের দৃষ্টিতে বাহ্যিকভাবে যে কাফের আভ্যন্তরিণ আকীদা বিশ্বাসেও সে কাফেরই হবে।

খণ্ডন:

দলীল থেকে বুঝাই যাচ্ছে, এটা একটা ধারণাপ্রসূত কথা মাত্র। মজবুত কোন দলীলের উপর তা প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং তা কুরআন হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরিত। কুরআন হাদিস এবং ইতিহাস থেকে শুধু ইয়াহুদিদের অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করলেই পরিষ্কার বুঝা যায়, আকীদা বিশ্বাসে পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকার পরও শুধু খাহেশাতের বশবর্তী হয়ে কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থে কুফরীতে লিপ্ত হতে পারে। ইয়াহুদিরা তাদের নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস রাখার পরও তাদের অনেককে হত্যা করেছে। আবার অনেককে হত্যার চেষ্টা করেছে। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার পরও তারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চিনে, যেমন চিনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে। (বাক্বারা ১৪৬)

অন্য আয়াতে বলেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চিনে যেরূপ চিনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। যারা নিজদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। (আনআম ২০)

ইয়াহুদিরা মদীনার পৌত্তলিকদেরকে ভয় দেখাতো যে, শেষ নবী আসলে তারা তার সাথে মিলে তাদেরকে পরাজিত করবে। কিন্তু শেষ নবী আসার পর জেনে বুঝেও তারা তার ধর্ম গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ(90)

আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এল, আর তারা (এর মাধ্যমে) পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব, কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত।(৮৯) যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে তা কত জঘন্য (তা এই) যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে এই জিদের বশবর্তী হয়ে যে, আল্লঅহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উপর তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করেছেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের অধিকারী হল। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।(৯০) (বাক্বারা ৮৯-৯০)

ফিরআউন এবং তার কওমের ব্যাপারে বলেন,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। (নামল ১৪)

তারা অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস করার পরও শুধু অহমিকার কারণে অস্বীকার করেছে। সুতরাং স্পষ্টই যে, অন্তরে ঈমান থাকার পরও যাহিরিভাবে কুফরী করা সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয় কুরআন হাদিস ও ইতিহাস স্বাক্ষী যে, বাস্তবে অসংখ্য অগণিত ব্যক্তির বেলায় তা ঘটেছেও। অহমিকা, খাহেশাত কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে অন্তরে ঈমান থাকার পরও বাহ্যত কুফরী করে চির জাহান্নামী হয়েছে।

একটি প্রশ্ন:

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যেহেতু অন্তরে ঈমান আছে তাহলে তাকে কাফের কেন সাব্যস্ত করা হলো? অন্তরের ঈমানের ভিত্তিতে তাকে মু'মিন ধরা হলো না কেন?

উত্তর:

ঈমান একটি শরয়ী বিষয়। এর সীমারেখা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তিনি ঈমানের মধ্যে যা কিছু ইচ্ছা শর্ত করতে পারেন। এতে বান্দার কোন দখল নেই। 'ঈমানে মুনজী' তথা আখেরাতে মুক্তির জন্য যে ঈমান প্রয়োজন তার সীমারেখা আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করেছেন। তিনি শুধু আভ্যন্তরিণ ঈমানকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট গণ্য করেননি। বরং বাহ্যিক আমলকেও শর্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা যে সীমারেখা দিয়েছেন তাই 'ঈমানে মুনজী' বলে গণ্য হবে। এতে বান্দার কিছু বলা কওয়ার অধিকার নেই। বান্দার উপর আবশ্যক আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নেয়া। এতেই তাদের কামিয়াবি।

ইবনুল হুমাম রহ. এর বক্তব্য:

ইমাম আবুল কাসেম আল-ইসফারায়িনী রহ. উক্ত ভুল আকীদা পোষণ করতেন। ইবনুল হুমাম রহ. তাঁর খণ্ডন করেছেন। ঈমানের জন্য যে শুধু আভ্যন্তরিণ বিশ্বাস যথেষ্ট নয় বরং কুফরে আমলী (যেমন-মূর্তিকে সাজদা করা, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা করা, কুরআনে কারীম বা কা'বা শরীফের শানের

অবমাননা করা কিংবা এ জাতীয় অন্যকোন দ্বীনের অবমাননাকর কাজ) থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক- এই আলোচনার পর তিনি বলেন,

قال الإمام أبو القاسم الإسفرايني بعد ذكرها : "إذا وجد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه". إلى أن قال: "لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان". و لا يخفى على متأمل أن بعض هذه قد يثبت و صاحبها مصدق لغلبة الهوى ... فيمكن اعتبار هذه الأمور أجزاء لمفهوم الإيمان. اهـ

"ইমাম আবুল কাসেম আল-ইসফারায়িনী রহ. এগুলো [অর্থাৎ মূর্তিকে সাজদা করা, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা করা, কুরআনে কারীম বা কা'বা শরীফের শানের অবমাননা করা ... ইত্যাদী কুফরে আমলী] উল্লেখ করার পর বলেন, 'এগুলো পাওয়া গেলে বুঝা যাবে তাসদীক যেটিই হচ্ছে মূলত ঈমান সেটি তার অন্তরে বিদ্যমান নেই।' এরপর সামনে গিয়ে বলেন, 'কারণ এটি অসম্ভব যে, যার ঈমান আছে শরীয়ত তাকে কাফের সাব্যস্ত করবে।' কোন চিন্তাশীলের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে তার থেকে এসব বিষয়ের [অর্থাৎ মূর্তিকে সাজদা করা, কোন নবীকে হত্যা বা তাঁর শানের অবমাননা করা, কুরআনে কারীম বা কা'বা শরীফের শানের অবমাননা করা ... ইত্যাদী কুফরে আমলী] কোন কোনটা প্রকাশ পেতে পারে। ... কাজেই এগুলোকে [অর্থাৎ এসব কুফরে আমলী থেকে বেঁচে থাকাকে] ঈমানের মৌলিক অংশ ধরা যেতে পারে।" (আল-মুসায়ারাহ্ ২৮০-২৮৩)

সামনে গিয়ে বলেন ,

و إذا ظهر ثبوت التصديق مع الكفر، لأنا لا نجد مانعا في العقل من أن يقول جبار عنيد لنبي كريم صدق بلسانه مطابقا لاعتقاد جنانه ثم يقتله لغلبة هوى، بل قد وقع كثيرا على ما يظهر عليه من تتبع القصص، فإن بعضها يفيد قتل بعضهم مع العلم بنبوتهم، وبعضها يفيد قصد قتل بعضهم مع ذلك، غير أن الله سبحانه سلم ... فلا يكون وجود نحو هذا دالا على انتفاء التصديق من القلب،

كما ظنه الأستاذ، على ما قدمناه عنه ، بل على عدم اعتباره منجيا شرعا. والإيمان وضع إلهي له تعالى أن يعتبر في تحقق لازمه الذي قدمناه ما شاء مع التصديق.اهـ (293-294)

“অতএব, পরিষ্কার যে, বাহ্যিক কুফরী সত্ত্বেও অন্তরে বিশ্বাস থাকতে পারে। কারণ, আকলে এ বিষয়ে কোন বাধা দেখি না যে, কোন প্রতাপশালী দাম্ভিক লোক কোন সম্মানিত নবীকে অন্ত:করণে বিশ্বাস এবং বাহ্যিকভাবে সত্যায়ন করার পরও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হত্যা করে ফেলবে। বরং ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় বাস্তবে এমন অনেক ঘটেছে। কোন কোন ঘটনা স্বাক্ষী যে, কোন কোন নবীকে নবী হিসেবে জানা-শুনার পরও হত্যা করে দিয়েছে। আর কোন কোন নবীকে হত্যা করতে চেয়েছে তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে হেফাযত করেছেন।

... কাজেই, এ ধরণের কাজ প্রকাশ হওয়াটা এ কথা বুঝায় না যে, অন্তরে তাসদীক-বিশ্বাস ও সত্যায়ন নেই। যেমনটা ধারণা করেন উস্তাদ (আবুল কাসেম আল-ইসফারায়িনী রহ.); যেমনটা আমি তার থেকে পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। এ ধরণের কাজ প্রকাশ পাওয়া বরং এ কথা বুঝায় যে, তার এ তাসদীক ও বিশ্বাস শরীয়তের দৃষ্টিতে ‘মুনজী’ তথা পরকালে নাজাতের ওসীলা বলে গণ্য হবে না।

আর ঈমান একটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিষয়। তার আবশ্যিক প্রতিদান [তথা চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও জান্নাত] যার কথা আমি পূর্বে বলে এসেছি, সেটি লাভের জন্য তিনি তাতে তাসদীক ও বিশ্বাসের সাথে যা খুশি ইচ্ছা শর্তরূপে নির্ধারণ করতে পারেন।” (আল-মুসায়ারাহ্ ২৯৩-২৯৪)

==========

অতএব, **‘যার যাহের কুফর তার বাতেনও কুফর’** কথাটা সঠিক নয়। যাহিরি কুফর সত্ত্বেও অন্তরে ঈমান থাকতে পারে, যদিও এর দ্বারা সে মু’মিন বলে গণ্য হবে না; আবার অন্তরে ঈমান থাকার পরও যাহিরি আমলের কারণে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমান আমল হিফাযত করুন। আমীন!!

==========

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৬৫৫

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৭

কুফরে আমলী সম্পর্কে জরুরী কয়েকটি বিষয়:

Ahmad Al-hindi

Member

০৫-২৫-২০১৭

১. কাফের হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় কুফরী কথা বা কাজে লিপ্ত হওয়াই যথেষ্ট; এর দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য নেয়া, দ্বীনের অবমাননা কিংবা কাফের হওয়ার ইচ্ছা থাকা জরুরী নয়:

কোন ব্যক্তি এমন কোন কর্মে লিপ্ত হলো যা আল্লাহ তাআলা, তাঁর কোন নবী বা রাসূল, তাঁর নাযিলকৃত কোন কিতাব, তাঁর দ্বীন বা দ্বীনের কোন সুস্পষ্ট বিষয়ের অবমাননা বুঝায়; কিন্তু সে তাতে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা কোন ধরণের অবমাননার ইচ্ছা করেনি, বরং শুধু খাহেশাতের কারণে বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে তাতে লিপ্ত হয়েছে- তাহলে কি সে কাফের হবে? না'কি কাফের হওয়ার জন্য অবমাননার ইচ্ছা থাকা জরুরী?

উত্তর: সে কাফের হয়ে যাবে। স্বেচ্ছায় কুফরী কর্মে লিপ্ত হওয়াই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর দ্বারা অবমাননার ইচ্ছা করা শর্ত নয়।

আল্লামা শামী রহ. বলেন,

ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف.اهـ

"যা কিছুই অবমাননা বুঝায় তার দ্বারাই তাকফীর করা হবে, যদিও অবমাননা করা তার উদ্দেশ্য না হয়।" (ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৬)

কেউ স্বেচ্ছায় কোন কুফরী কথা বলল কিন্তু সে এর কুফরী অর্থ উদ্দেশ্য নেয়নি এবং কাফের হয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছাও করেনি, বরং এমনিতেই কথার কথায়, খেলাচ্ছলে, রসিকতা করে বা ঠাট্টাস্বরূপ বলেছে মাত্র। বলার সময় এবং বলার পরেও তার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস বহাল ছিল। এখন কি সে কাফের হয়ে

যাবে? লক্ষ্যণীয় যে, সে কুফরী অর্থও উদ্দেশ্য নেয়নি, কাফের হওয়ার নিয়তও করেনি বরং তার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস বহাল ছিল এবং আছে।

উত্তর: সে কাফের হয়ে গেছে। তার অন্তরের বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না। বান্দার কাছেও সে কাফের আল্লাহ তাআলার কাছেও সে কাফের। দুনিয়াতেও সে কাফের আখেরাতেও সে কাফের এবং চিরস্থায়ী দোযখের অধিবাসী।

ফাতাওয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে,

رجل كفر بلسانه طائعا، وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا كذا في فتاوى قاضي خان.

"ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি মুখে কুফরী করল অথচ তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ সে কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার কাছেও সে ঈমানদার বলে ধর্তব্য হবে না। ফতাওয়া কাজী খানে এমনি আছে।" (ফাতাওয়া আলমগীরি: ২/২৮৩)

আরো বলা হয়েছে,

الهازل، أو المستهزئ إذا تكلم بكفر استخفافا واستهزاء ومزاحا يكون كفرا عند الكل، وإن كان اعتقاده خلاف ذلك.

"যে ব্যক্তি অবজ্ঞাপূর্বক, উপহাসস্বরূপ কিংবা রসিকতা করে কুফরী কথা বলল সে সকলের ঐক্যমতে কাফের হয়ে গেছে, যদিও তার অন্তরের বিশ্বাস এর বিপরীত হয়।" (ফাতাওয়া আলমগীরিত: ২/২৭৬)

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন,

قال القونوى :ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له يكفر، لأنه راض بمباشرته وإن لم يرض بحكمه، ولا يعذر بالجهل، وهذا عند عامة العلماء، خلافا للبعض ... "شرح فقه أكبر". وفيه أيضا: ثم أعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر، عالما بمبناها ولا يعتقد معناها، لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في تأديته، فإنه يحكم عليه بالكفر ... وهذا في "شرح الشفاء" أيضا৬৯/১.

“কূনাবী রহ. বলেন, বিশ্বাস করা ছাড়া শুধু মৌখিকভাবেও যদি স্বেচ্ছায় কুফরী কথা উচ্চারণ করে তবুও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, সে উক্ত কুফরী কথা বলার কারণে যে বিধান তার উপর আপতিত হবে তাতে সন্তুষ্ট না হলেও, উক্ত কথা বলতে সে রাজি হয়েছে। আর অজ্ঞতার কারণে তাকে মাফ করা হবে না। অধিকাংশ উলামার এটিই মত। তবে কেউ কেউ ভিন্ন কথা বলেন। ... ‘শরহু ফিকহিল আকবার’। এতে এও বলা হয়েছে যে, জেনে রাখ, কুফরী কথাকে কুফরী কথা হিসেবে জানার পর স্বেচ্ছায় কোন চাপ প্রয়োগ ব্যতীত যদি তা উচ্চারণ করে তাহলে কাফের হয়ে গেছে বলে হুকুম দেয়া হবে; যদিও অন্তকরণে তা বিশ্বাস না করে। ‘শিফা’র ব্যাখ্যাগ্রন্থেও এমনি বলা হয়েছে।” (ইকফারুল মুলহিদীন: ১/৬৯)

কোন ব্যক্তি এমন কোন কথা বলল যা কুফর, কিন্তু সে জানে না যে তা কুফর। সে কি কাফের হয়ে যাবে? না’কি না জানার কারণে মাফ পেয়ে যাবে? উত্তর: কেউ কেউ বলেন, না জানার কারণে সে কাফের হবে না। তবে সহীহ কথা হলো সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, সে ইচ্ছাকৃতভাব কুফরী কথা বলেছে। না জানার কারণে সে মাফ পাবে না।

ফাতাওয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে,

ومن أتى بلفظة الكفر، وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض، ولا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কুফরী কথা বলল কিন্তু সে জানে না যে, তা কুফর, অধিকাংশ উলামার মতে সে কাফের হয়ে যাবে। তার অজ্ঞতাটা ওজর বলে গণ্য হবে না। তবে কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন। ‘খোলাসা’তে এমনি আছে।” (ফাতাওয়া আলমগীরিত: ২/২৭৬)

 # مسلم قال: أنا ملحد يكفر، ولو قال: ما علمت أنه كفر لا يعذر بهذا

“ যদি কোন মুসলমান বলে, ‘আমি মুলহিদ-নাস্তিক’ তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যদি বলে, এটা যে কুফর আমি তা জানি না- তবুও তা ধর্তব্য হবে না।” (ফাতাওয়া আলমগীরি: ২/২৭৯)

#وفي اليتيمة سألت والدي عن رجل قال: أنا فرعون، أو إبليس فحينئذ يكفر كذا في التتارخانية.

"'আল-ইয়াতীমাহ্' কিতাবে আছে, আমি আমার পিতাকে এক মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যে বলেছে, 'আমি ফেরআউন' বা 'আমি ইবলীস'- (তার কি বিধান?) তিনি উত্তর দিলেন, 'তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে'। 'তাতারখানিয়া'তে এমনি আছে।" (ফাতাওয়া আলমগীরি: ২/২৭৯)

কাফেরদের ধর্মীয় প্রতীক 'পৈতা' বাঁধার দ্বারা কাফের হয়ে যায়। এমনকি রশি বেঁধে যদি বলে, 'এটি পৈতা' তবুও কাফের হয়ে যাবে।

امرأة شدت على وسطها حبلا وقالت: هذا زنار تكفر كذا في الخلاصة.

"যদি কোন মহিলা কোমরে রশি বেঁধে বলে, 'এটি পৈতা' তাহলে কাফের হয়ে যাবে। 'খোলাসা'তে এমনি আছে।" (ফাতাওয়া আলমগীরি: ২/২৭৭)

উপরোক্ত মাসআলাগুলো আনার দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, কাফের হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় কুফরী কথা বা কাজে লিপ্ত হওয়াই যথেষ্ট। কুফর উদ্দেশ্য নেয়া, অবমাননার নিয়ত করা, কাফের হওয়ার ইচ্ছা করা ইত্যাদী কোন কিছুই শর্ত নয়। এমনকি উক্ত কথা বা কাজ যে কুফর অনেক ক্ষেত্রে সেটা জানাও শর্ত নয়।

শেষে আল্লামা কাশ্মীরী রহ. এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি বলেন,

أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام.

"দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়াই, কিংবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে নেয়া ব্যতীতই মুসলমান দ্বীন থেকে বের হয়ে যেতে পারে।" (ইকফারুল মুলহিদীন: ১/৩০)

২. নামায-রোযা ও অন্যান্য বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগির পূর্ণ পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও কাফের হতে পারে:

কোন ব্যক্তি কুফরী কথা বা কাজে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে। হতে পারে সে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পরও নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগির পূর্ণ

পাবন্দি করছে। তার বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগি তাকে কাফের হওয়া থেকে বাঁচাত পারবে না।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন,

فمن أنكر شيئا من الضروريات ... لم يكن من أهل القبلة، ولو كان مجاهدا بالطاعات، وكذلك من باشر شيئا من إمارات التكذيب كسجود الصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه، فليس من أهل القبلة

"যে ব্যক্তি জরূরিয়্যাতে দ্বীনের কোন একটাকেও অস্বীকার করে সে আহলে কিবলা (তথা ঈমানদার) বলে গণ্য হতে পারে না, **যদিও ইবাদত বন্দেগিতে খুব পাবন্দ হয়।** তদ্রূপ সে ব্যক্তিও আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না যে এমন কোন কর্মে লিপ্ত হয় যা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আলামত। যেমন- মূর্তিকে সাজদা করা, শরীয়তের কোন বিষয়ের অবমাননা করা কিংবা তা নিয়ে উপহাস করা।" (ইকফারুল মুলহিদীন: ১/১৭)

মোট কথা, কুফরীতে লিপ্ত হয়ে ইবাদত বন্দেগি যতই করুক ঈমানদার বলে গণ্য হবে না।

৩. নিজেকে মুসলমান মনে করা এবং মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও কাফের হতে পারে:

কুফরীতে লিপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে কাফের মনে নাও করে বরং মুসলমানই মনে করে এবং মুসলমান হিসেবেই নিজেকে দাবি করে এবং পরিচয় দেয়, মুসলমান হিসেবেই সে থাকতে চায়, আখেরাতে মুসলমান হিসেবেই উঠতে চায়, তবুও সে কাফের। নিজেকে মুসলমান মনে করা বা দাবি করার দ্বারা মুসলমান বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না কুফর থেকে তাওবা করে ঈমানদার হবে।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন,

وكذلك ... نكفر بكل فعل فعله شخص مسلم، أجمع المسلمون على أنه - أي ذلك الفعل - لا يصدر إلا من كافر حقيقة ... وإن كان صاحبه - أي من صدر منه

- مسلما مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل. "شرح شفاء" للخفاجي ملتقطا ملخصا. ومثله في "شرح الملا على القارئ" سواء.

“প্রত্যেক এমন কর্ম যার ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে, তা প্রকৃত কাফের ব্যতীত অন্য কারো থেকে প্রকাশ পেতে পারে না- কোন মুসলমান তাতে লিপ্ত হলে এর দ্বারা আমরা তাকে তাকফীর করবো, **যদিও উক্ত কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি তাতে লিপ্ত হওয়ার পরও সুস্পষ্টরূপে নিজেকে মুসলমান হিসেবে ঘোষণা দেয়।** খাফফাজী রহ. এর শরহে শিফা থেকে গৃহীত। মোল্লা আলী ক্বারী রহ. এর শরাহ তেও হুবহু এমনি বলা হয়েছে।” (ইকফারুল মুলহিদীন: ১/৫৮)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৯০০

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৮

৪. একটি মহা সংশয়: নিরানব্বইটা কুফরী করলেও কাফের হয় না!

Ahmad Al-hindi

Member

০৫-২৫-২০১৭

আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে একটি সংশয় প্রচলিত যে, **কেউ যদি নিরানব্বইটা কুফরী কাজ করে আর একটা কাজ ভাল করে তবুও তাকে কাফের বলা যাবে না, মুসলমানই বলতে হবে।**

এই সংশয়টা যে শুধু জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত তাই নয়, অনেক তালিবুল ইলম এমনকি অনেক আলেমের মাঝেও বিদ্যমান। তারা মনে করে, কেউ যদি একশোর মধ্যে নিরানব্বইটা কাজই কুফরী করে আর একটা কাজ এমন করে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে মুসলমান তবুও তাকে মুসলমানই বলতে হবে, কাফের বলা যাবে না।

একবার এক তালিবুল ইলম এক মসজিদে ওয়াজ করলো যে, যারা সুদকে হারাম মনে করে, তবুও খায় তারা কাফের হবে না, তবে কবীরা গুনাহে লিপ্ত। আর যারা সুদকে হালাল মনে করে খায় তারা কাফের, চিরস্থায়ী দোযখী। যেহেতু মুসল্লীদের অনেকেই সুদখোর ছিল তাই ওয়াজটা তাদের কাছে ভাল ঠেকলো না। সম্ভবত কেউ কেউ উক্ত তালিবুল ইলমের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী একজনের কাছে নালিশও করলো। তখন উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি সহ আরেকজন তালিবুল ইলম তাকে বুঝালো যে, এভাবে ওয়াজ করা উচিৎ নয়। কারণ, একেতো এতে সমাজের মানুষ বিরুদ্ধে চলে যাবে, আরেকতো কথা হলো, কেউ নিরানব্বইটা কুফরী করলে আর একটা ঈমানী কাজ করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। তাহলে শুধু সুদকে হালাল মনে করলে কাফের কিভাবে বলা হবে??

এই হলো আমাদের সমাজের ঈমান আকীদার হালত। যে বিষয়গুলো প্রতিটি মুমিনের জানা থাকার কথা ছিল তা আজ শতে হাজারেও একজনে জানে না। ফা ইলাল্লাহিল মুশতাকা...।

সংশয়টা সৃষ্টি হলো কোত্থেকে?

প্রথমত কথা হলো, সংশয়টা শয়তান এবং তার আউলিয়ারা ছড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত বলা যেতে পারে যে, সংশয়টা ফুকাহায়ে কেরামের একটা বক্তব্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বলে থাকেন, **যদি কোন একটা কথা বা কাজ এমন হয় যে, তার অনেকগুলো ব্যাখ্যা হতে পারে যার প্রত্যেকটা অনুযায়ীই উক্ত কথা বা কাজে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের বলে সাব্যস্ত হয়, আর একটা ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে কুফর থেকে বাঁচানো যায়, তাহলে মুফতীর জন্য উচিৎ হলো উক্ত ব্যক্তিকে কাফের ফতোয়া না দেয়া।**

সম্ভবত উক্ত বক্তব্য থেকেই সংশয়টা ছড়িয়েছে যে, নিরানব্বইটা কুফরী কাজ করলে আর একটা ঈমানী কাজ করলেও কাফের হবে না, মুসলমানই থেকে যাবে।

প্রকৃত ঘটনাটা কি?

আসলে যারা ফুকাহায়ে কেরামের উক্ত বক্তব্য থেকে সংশয়ে পড়েছেন তারা ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যটা বুঝতে ভুল করেছেন।

প্রথমত: ফুকাহায়ে কেরাম একশো কিংবা অনেকগুলো কথা বা কাজ নিয়ে কথা বলছেন না, তাঁরা কথা বলছেন একটা কথা বা কাজ নিয়ে যার অনেকগুলো ব্যাখ্যা হতে পারে যার সবগুলো অনুযায়ীই উক্ত কথা বা কাজ কুফরের মধ্যে পড়ে, আর একটা ব্যাখ্যা এমনও করা সম্ভব যার মাধ্যমে উক্ত কথা বা কাজকে কুফরের অন্তর্ভুক্ত গণ্য নাও করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: ফুকাহায়ে কেরামের উক্ত বক্তব্য হচ্ছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যে উক্ত কথা বা কাজে লিপ্ত হয়েছে কিন্তু তার উদ্দেশ্য জানা যাচ্ছে না। অর্থাৎ সে কি কুফরী দিকগুলোর কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েছে, না'কি ঈমানী ব্যাখ্যাটা উদ্দেশ্য নিয়েছে তা জানা যাচ্ছে না।

বিষয়টা আরেকটু খুলে বলি। উক্ত কথা বা কাজে লিপ্ত ব্যক্তির তাতে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য ছিল সে ব্যাপারে তিনটা অবস্থা হতে পারে:

এক. তার ব্যাপারে যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, সে উক্ত কথা বা কাজের দ্বারা কুফরী দিকগুলোর কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েছে তাহলে সে নি:সন্দেহে কাফের।

দুই. যদি জানা যায় যে, সে কুফরী দিকগুলোর কোনটাই উদ্দেশ্য নেয়নি বরং ঈমানী ব্যাখ্যাটাই উদ্দেশ্য নিয়েছে, তাহলে সে নি:সন্দেহে মুসলমান।

তিন. আর যদি জানা না যায় যে, সে কোন ব্যাখ্যাটা উদ্দেশ্য নিয়েছে, তখন তার ব্যাপারে কি ফতোয়া দেয়া হবে? কাফের ফতোয়া দেয়া হবে, না'কি ঈমানদার ফতোয়া দেয়া হবে? যদি কুফরী ব্যাখ্যাগুলোর কোন একটা ধরা হয় তাহলে তো কাফের। আর যদি ঈমানী ব্যাখ্যাটা উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে মুমিন। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, এমতাবস্থায় তাকে কাফের ফতোয়া দেয়া হবে না বরং ঈমানী ব্যাখ্যাটা ধরে তাকে মুমিনই ফতোয়া দেয়া হবে।

কারণ,

১. সে ঈমানদার ছিল নিশ্চিত। এখন উক্ত কথা বা কাজের দ্বারা কাফের হয়েছে কি'না তা সন্দেহপূর্ণ। আর সন্দেহের দ্বারা নিশ্চিত ও ইয়াকীনি বিষয় দূর হয় না। কাজেই সে আগে যেমন মুমিন ছিল উক্ত কথা বা কাজের পরও তাকে মুমিনই ধরা হবে।

২. মুমিনের ব্যাপারে ভাল ধারণা করা শরীয়তের নির্দেশ। মুমিনের কথা বা কাজের যদি ভালো ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে তার মন্দ ব্যাখ্যা করা হবে না। এখানে যেহেতু এক ব্যাখ্যা মতে তার উক্ত কথা বা কাজকে কুফর হওয়া থেকে এবং তাকে কাফের হওয়া থেকে বাঁচানো যায়, কাজেই সে এই ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য নিয়েছে বলে ধরা হবে।

৩. কোন মুসলমানকে কাফের বলা অতীব ভয়াবহ বিষয়। কাজেই কোন মতে যদি তাকে ঈমানের গন্ডির ভিতর রাখা যায় তাহলে কাফের বলা হবে না। এখানে যেহেতু এক ব্যাখ্যা মতে তাকে ঈমানদার রাখা যাচ্ছে এবং তার উদ্দেশ্য কি তা জানা যাচ্ছে না, কাজেই এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করে তাকে ঈমানদার ফতোয়া দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ, সে যদি কুফর উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহ তাআলার কাছে অবশ্যই কাফের বলে গণ্য হবে। আমাদের মুমিন ফতোয়া দেয়ার দ্বারা তার কোন ফায়েদা হবে না।

এবার ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য লক্ষ্য করি ইনশাআল্লাহ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ফাতাওয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে,

إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر، ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه كذا في الخلاصة في البزازية إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر، فلا ينفعه التأويل حينئذ كذا في البحر الرائق، ثم إن كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير، فهو مسلم، وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتي، ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته كذا في المحيط.

"যখন কোন মাসআলায় অনেকগুলো ব্যাখ্যা থাকে যেগুলো কুফরকে সাব্যস্ত করে আর একটা ব্যাখ্যা এমন থাকে যা কুফরকে প্রতিহত করে, তখন মুফতীর জন্য আবশ্যক হলো উক্ত কুফর প্রতিহতকারী ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করা। 'খোলাসা'তে এমনি বলা হয়েছে। তবে 'বাযযাযিয়্যা' [আরেকটু অতিরিক্ত] বলা হয়েছে যে, তবে যদি সে সুস্পষ্ট বলে দেয় যে, সে কুফর উদ্দেশ্য নিয়েছে তাহলে হিসাব ভিন্ন[অর্থাৎ কাফের হয়ে যাবে]। তখন অন্য ব্যাখ্যা করা তার কোন উপকারে আসবে না। 'আল-বাহরুর রায়েক' এ এমনি বলা হয়েছে। অত:পর উক্ত কথায় লিপ্ত ব্যক্তির নিয়্যত যদি ঐ ব্যাখ্যাটি হয়ে থাকে যা কুফরকে প্রতিহত করে তাহলে সে মুসলমান। আর যদি ঐ ব্যাখ্যাটি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে যা কুফরকে সাব্যস্ত করে তাহলে মুফতীর ভিন্ন ফতওয়া দেয়া তার কোন উপকারে আসবে না। তাওবা করে তা থেকে ফিরে আসতে এবং তার ও তার স্ত্রীর মাঝে নতুন করে বিবাহ পড়িয়ে নিতে আদেশ দেয়া হবে। 'আল-মুহীত' এ এমনি বলা হয়েছে।" (ফাতাওয়া আলমগীরিত: ২/২৮৩)

এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল,

১. আলোচনাটা একটা কুফরী কথা প্রসঙ্গে, একশো বা নিরানব্বই কুফর প্রসঙ্গে নয়।

২. ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট বলে দেয় যে, সে কুফর উদ্দেশ্য নেয়নি বরং ঐ ব্যাখ্যাটি উদ্দেশ্য নিয়েছে যা কুফর নয়- তাহলে সে মুসলমান।

৩. আর যদি বলে যে, সে কুফর উদ্দেশ্য নিয়েছে তাহলে কাফের।

৪. কুফর উদ্দেশ্য নেয়ার পরও যদি মুফতী সাহেব ঘুরিয়ে কুফর প্রতিহতকারী ভিন্ন ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করে তাকে মুসলমান ফতোয়া দেয় তাহলে এই ফতোয়া তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলার কাছে সে কাফের বলেই গণ্য হবে।

৫. আলোচনা হচ্ছে এমন কুফরী কথা প্রসঙ্গে যা কুফর হওয়াটা নিশ্চিত নয়, বরং তাতে দুই ধরণের অবকাশ আছে। কুফর হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু যদি এমন কোন কুফরী কথা বলে বা কুফরী কাজ করে যা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তাহলে নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে যাবে। **সামনে আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যে বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।**

তিনি বলেন,

ما تيقن أنه ردة يحكم بها وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام ... اهـ ما في جامع الفصولين. وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر اهـ وفي الخلاصة وغيرها :إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم .زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل ح وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اهـ والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة ... اهـ

"যেটির ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তা কুফর- সেটিতে লিপ্ত হলে কাফের হয়ে গেছে বলে ফায়সালা দেয়া হবে। আর যেটির কুফর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে যে, সেটিতে লিপ্ত হলে কাফের হয়ে গেছে বলে ফায়সালা দেয়া হবে না। কেননা, ব্যক্তির মুসলমান হওয়া যা সুনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত ছিল তা সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের মাধ্যমে দূর হয়ে যাবে না। তাছাড়া ইসলাম তো সর্বদা বিজয়ী থাকে। ... 'জামিউল

ফুসুলাইন' এর বক্তব্য শেষ হল। 'আল-ফাতাওয়াস সুগরা' তে আছে, কুফর অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়। কাজেই কোন মুসলমানকে আমি কাফের হয়ে গেছে বলে ফতওয়া দেব না, যদি এমন কোন বর্ণনা পাই যে, সে কাফের হবে না। 'খোলাসা' সহ অন্যান্য কিতাবে আছে, যখন কোন মাসআলায় অনেকগুলো ব্যাখ্যা থাকে যেগুলো তাকফীরকে আবশ্যক করে আর একটা ব্যাখ্যা এমন থাকে যা তাকফীরকে প্রতিহত করে, তখন মুফতীর জন্য আবশ্যক হলো উক্ত কুফর প্রতিহতকারী ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করা। কেননা, মুসলমানের ব্যাপারে ভাল ধারণা করা চাই। 'বাযযাযিয়্যা' তে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, তবে যদি এমন ব্যাখ্যা সে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে যা কুফরকে আবশ্যক করে তাহলে ঘুরিয়ে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করা তার কোন উপকারে আসবে না। 'হালাবী'। 'তাতারখানিয়া'তে বলা হয়েছে, এমন কিছুর দ্বারা তাকফীর করা হবে না যা ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কেননা, কুফর হচ্ছে সর্বোচ্চ শাস্তি যা সর্বোচ্চ অপরাধের বিনিময়ে বর্তাবে। আর যেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে সেখানে অপরাধ সর্বোচ্চ পর্যায়ের নয়। 'তাতারখানিয়া'র বক্তব্য শেষ হল। মোটকথা, যদি মুসলমানের কথাকে ভালোর উপর প্রয়োগ করা যায়, কিংবা তা কুফর না হওয়ার ব্যাপারে কোন দুর্বল রিওয়ায়াতও থাকে তবুও তাকে কাফের ফতোয়া দেয়া হবে না।" (ফাতাওয়া শামী: ৪/২২৪, বাবুল মুরতাদ)

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্য পরিষ্কার। এখান থেকে আরো একটা বিষয় বুঝা গেল যে, যদি কোন কথা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোন দুর্বল মতভেদও থাকে তবুও এর দ্বারা তাকফীর করা হবে না। আর যা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই তাতে লিপ্ত হলে কাফের হয়ে গেছে বলে ফতোয়া দেয়া হবে।

মোটকথা, কাফের হওয়ার জন্য একটা কুফরই যথেষ্ট। 'নিরানব্বইটা কুফর করলেও কাফের হবে না' কথাটা যে সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন তাতে আশাকরি আর কোন সন্দেহ নেই।

বি.দ্র-১: উপরোক্ত ক্ষেত্রে যদিও ঐ ব্যক্তিকে কাফের ফতওয়া দেয়া হবে না, তবে তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়া হবে এবং সতর্কতাবশত তার স্ত্রীর সাথে নতুন করে বিবাহ পড়িয়ে নিতে আদেশ দেয়া হবে। (ফাতাওয়া শামী: ৪/২৩০, বাবুল

মুরতাদ)

বি.দ্র.-২: উপরোক্ত আলোচনা হচ্ছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যে একটামাত্র কুফরী কথা একবার মাত্র বলেছে। আর কুফরী কথাটাও এমন যা কুফর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে বা মতভেদ আছে। আর যারা যুগের পর যুগ ধরে অবিরাম সুস্পষ্ট কুফর করে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে উক্ত আলোচনা নয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৯০১

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -৯

Ahmad Al-hindi

Member

০৬-০১-২০১৭

আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন কুফরে আমলী যার দ্বারা ব্যক্তি দ্বীন থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়

আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন কুফরে আমলী। অর্থাৎ তা এমন কাজ স্বয়ং যার দ্বারাই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। তাতে লিপ্ত হওয়ার পর আর তার আকীদা বিশ্বাসের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। তার আকীদা বিশ্বাস যাই হোক সে মুরতাদ। সে আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে অপছন্দ করে কি'না, শরীয়ত বিরোধি আইনকে শরয়ী বিধানের উপর প্রাধান্য দেয় কি'না... ইত্যাদী কোন কিছুই দেখার দরকার নেই। আকীদা বিশ্বাস যদি পূর্ণ দুরস্তও থাকে, মুখে যদি সব কিছুর স্বীকৃতিও প্রদান করে, বাহ্যিক নামায-রোযা ইত্যাদী সকল দ্বীনের বিধান যদি পালনও করে তবুও সে মুরতাদ।

আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগির পাবন্দ হওয়া সত্ত্বেও কাফের হতে পারে। কাজেই আপত্তির কোন সুযোগ নেই যে, 'আমাদের শাসকরা তো শরীয়তকে অপছন্দ করে বলে না, মৌখিক ইসলামের দাবিও করে, নামায-রোযাও পালন করে- এতদসত্ত্বেও কাফের হবে কিভাবে?' কারণ, আমরা তাদেরকে শরীয়ত অপছন্দ করার কারণে কিংবা শরীয়তকে হক বলে বিশ্বাস না করা কিংবা স্বীকার না করার কারণে কাফের বলছি না। আমরা তাদেরকে কাফের বলছি কারণ তারা এমন কাজে লিপ্ত হয়েছে যা নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ কুফর। তাতে লিপ্ত হওয়াই কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সাথে আর কোন কিছুর দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের থেকে যদি অন্য কুফরও পাওয়া যায় তাহলে সেটা (কুফর আলাল কুফর) তথা কুফরীর উপর আরোও কুফরী হবে।

শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়নের ইতিহাসকে মৌলিকভাবে চারটি ধাপে ভাগ করতে পারি, যার দুটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার আগে, আর দু'টি আমাদের শরীয়ত নাযিল হওয়ার পর।

আমাদের শরীয়ত নাযিল হওয়ার পূর্বে:

১. ইয়াহুদ ও নাসারা আলেমদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন।

২. জাহিলী যামানায় আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন।

আমাদের শরীয়ত নাযিল হওয়ার পর:

১. তাতারীদের কতৃক শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন।
২. উসমানী খিলাফত পতন পরবর্তী শাসকবর্গ কতৃক শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন।

তাতারীরা মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার পরিবর্তে তাদের নেতা চেঙ্গিস খান কতৃক প্রণিত 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতো। এ কারণে তৎকালীন উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। যারা ইসলামী আদালতে বিচারের জন্য না গিয়ে তাতারীদের আদালতে বিচারের জন্য যাবে তারাও কাফের হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দেয়া হয়। যারা তাতারীদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তারাও কাফের হয়ে যাবে বলে ফতোয়া দেয়া হয়। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু ৭৭৪হি.) এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮হি.) এর ফতোয়া উল্লেখযোগ্য।

ইবনে কাসীর রহ. এর এ ব্যাপারে দু'টি ফতোয়া রয়েছে।

একটিতে তিনি তাতারীদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। এটি তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াত-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

(তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসন ব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?) এর ব্যাখ্যায় বিদ্যমান।

আরেকটিতে যারা ইসলামী আদালত ছেড়ে তাতারীদের আদালতে যাবে তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। এটি তারঁ বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'তে ৬২৪হিজরীর আলোচনাধীন চেঙ্গিস খানের জীবনী অংশে বিদ্যমান।

ইবনে তাইমিয়া রহ. যেসব নামধারী মুসলমান তাতারদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তারা মুরতাদ হয়ে গেছে বলে ফতোয়া জারি করেন। তাঁর ফতোয়াটি 'মাজমুউল ফাতাওয়া'র ২৮ নং খণ্ডের ৫৩০ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

***

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী খিলাফতের পতনের পর প্রায় গোটা বিশ্ব কাফেরদের হাতে চলে যায়। নামধারী মুসলমানরা কাফেরদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতায় বসে। তারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের রচিত শরিয়ত বিরোধি আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এ কারণে সর্বজন শ্রদ্ধেয় যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দেন। **তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হলেন,**

- শাইখুল ইসলাম মুস্তফা সবারী রহ.

- শাইখুল ইসলাম জাহেদ কাওসারী রহ.

- সায়্যিদ কুতুব রহ.

- শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম রহ.

- আল্লামা শানকীতী রহ.

- আহমাদ শাকের রহ.

- আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. প্রমুখ।

উলামায়ে কেরাম তাদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দেন এবং এ কথাও পরিষ্কার বলে দেন যে, তাদের কুফর তাদের আকীদা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়। তাদের আকীদা বিশ্বাস যাই হোক তারা মুরতাদ।

তাতারীদের এবং উসমানী খিলাফত পরবর্তী শাসকবর্গ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা **(দারুল ইসলাম ও দারুল হরব প্রসঙ্গে মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর দাবির পর্যালোচনা)** নামক পুস্তিকায় করা হয়েছে। তাই এখানে আর সে ব্যাপারে আলোচনায় যাবো না। এখানে প্রথম দু'টি ধাপ অর্থাৎ -

১. ইয়াহুদ ও নাসারা আলেমদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন।

২. জাহিলী যামানায় আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৯৭৭

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১০

Ahmad Al-hindi

Member

০৬-০২-২০১৭

১. ইয়াহুদ ও নাসারা আলেমদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন।

ইয়াহুদ ও নাসার আলেমরা দুনিয়াবি স্বার্থে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান প্রণয়ন করত এবং সেটাকেই সমাজে চালু করত। আর সমাজের লোকজনও আল্লাহ তাআলার বিধানের পরিবর্তে তাদের আলেমদের প্রণিত বিধান মেনে নিত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদ নাসারার আলেম ও জনসাধারণ সকলকেই কাফের সাব্যস্ত করেছেন। আলেমদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন আল্লাহ তাআলার বিধান বাদ দিয়ে নিজেরাই বিধান প্রণয়নের কারণে, আর জনসাধারণকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন আল্লাহ তাআলার আইনকে বাদ দিয়ে আলেমদের প্রণিত আইনকে মেনে নেয়ার কারণে।

আইন প্রণয়ন একমাত্র আল্লাহ তাআলার অধিকার। ইয়াহুদ নাসারার আলেমরা নিজেরাই আইন প্রণয়ন করে যেন তারা নিজেদেরকে রব দাবি করেছে, এ কারণে তারা কাফের। তদ্রূপ আনুগত্য শুধু এক আল্লাহ তাআলারই করতে হবে। তার আইনই কেবল মানতে হবে। ইয়াহুদ নাসারার জনসাধারণ আল্লাহ তাআলার আইন বাদ দিয়ে তাদের আলেমদের আইনকে মেনে নেয়ার দ্বারা যেন তারা তাদের আলেমদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কারণে তারাও কাফের।

আল্লাহ তআলা ইরশাদ করেন,

إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে তারা শুধু এক মা’বুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।’ (তাওবা ৩১)

হাদীস শরীফে এসেছে

غطيف بن أعين الشيباني قال إبراهيم نا مالك بن إسماعيل قال نا عبد السلام بن حرب قال نا غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي ﷺ يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم

'আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা বারাআ'র এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন: 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি বললাম, হ্যাঁ এমনটিই। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত।'

[আত-তারিখুর কাবীর লিল ইমাম বুখারী ৭ম খন্ড ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৩০৯৫; আল-মু'জামুল কাবীর লিত ত্বাবারানী: ১৭/৯২/২১৮,২১৯; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০ (সনদ: হাসান সহীহ)]

এই হাদীস থেকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় -পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকেরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করতো। যার ফলশ্রুতিতে তারা মিথ্যা রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে। আর যারা এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা যদিও আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করতো কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী সন্ন্যাসীদের বিধান গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তারা

আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে।

আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

"عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة أرأيت قول الله اتخذوا أحبارهم؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم

'আবুল বুখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হলো আল্লাহর বাণী **اتخذوا أحبارهم** সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বলেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের উদ্দেশ্যে নামায-রোজা করতো না। কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল, যখন পাদ্রীরা তাদের জন্য কোন কিছুকে হালাল করতো তারাও তাকে হালাল মেনে নিত আর আল্লাহ কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম করতো তারাও তা হারাম মেনে নিত, এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়া।' (তাফসীরে ত্বাবারী, হাদীস নং- ১৬৬৩৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যা:

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ﴾ قال عبد الله بن عباس: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أرباباً"

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন: পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ্ করতে আদেশ করতো না। বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, আর তারা তাদের আনুগত্য করতো। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।' (তাফসীরে ত্বাবারী, হাদীস নং- ১৬৬৪১)

উপরোক্ত আয়াত এবং এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হাদিস ও সাহাবীদের আছার থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার আইন বাদ দিয়ে তদস্থলে ভিন্ন আইন প্রণয়ন করা, আল্লাহর হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করা কুফর। যারা এ কাজে লিপ্ত হবে তারা

মুখে না হলেও তাদের কর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে রব দাবি করছে। যেমনটা আয়াত থেকে স্পষ্ট।

সায়্যিদ কুতুব রহ. বলেন,

فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه، فقد ادعى الألوهية اختصاصا وعملا، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء. و أيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية، سواء سماها باسمها أم لم يسمها!

"যে কোন ব্যক্তি নিজের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তৃত্বের দাবি করবে সে নিজেকে ইলাহ বলে দাবি করল। মুখে সে এই সীমালঙ্ঘনের কথা দাবি করুক বা না করুক, তার কাজের মাধ্যমে সে তা দাবি করেছে। আর অপর যে কোন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির জন্য এই কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিল সে তাকে ইলাহ বলে স্বীকৃতি দিল; চাই সে তাকে ইলাহ বলে নামকরণ করুক বা না করুক।" (মাআলিম ফিত-ত্বরীক : ৭৭)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০০০

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১১

ইয়াহুদী আলেমদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন:

Ahmad Al-hindi

Member

০৬-০৩-২০১৭

তাওরাতে যিনার শাস্তি ছিল রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। এ আইন দিয়েই বিচার ফায়সালার আদেশ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদিদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যখন খুব বেশি যিনায় লিপ্ত হয়ে গেল তখন তাদের ধর্মগুরুরা আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কারচুপির আশ্রয় নিল। যদি নিম্নশ্রেণীর কেউ যিনা করত তাহলে তাকে তাওরাতের বিধান মতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করত। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ যিনা করলে তাকে ছেড়ে দিত। এক সময় তারা এ স্বজনপ্রীতির কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হল। নিম্ন শ্রেণীর লোকজন নিজেদের লোকদের উপর রজম কায়েম করার বিপক্ষে অবস্থান নিল। তারা দাবি জানাল, যদি উঁচু শ্রেণীর লোকদের মাঝে রজম কায়েম না করা হয় তাহলে আমাদের লোকদের মাঝে রজম কায়েম করতে দেব না। অবস্থা বেগতিক দেখে ধর্মগুরুরা সিদ্ধান্ত নিল, তারা যিনার আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি বাদ দিয়ে নিজেদের থেকে এমন একটা শাস্তি নির্ধারণ করবে যা উঁচু নিচু সকলের উপরই প্রয়োগ করা যাবে। এতে তারা সমালোচনা থেকে বেঁচে যাবে, আবার তাদের স্বার্থও রক্ষা হবে। কথামতো তারা সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে যিনার শাস্তি আর রজম থাকবে না। যিনাকারী পুরুষ ও মহিলাকে চুনকালী মেখে মুখ কালো করে গাধার পিঠের উপর পরস্পরকে বিপরীতমুখী করে বসিয়ে বেত্রাঘাত করতে করতে জনগণের সামনে দিয়ে ঘুরানো হবে। এটাই যিনার শাস্তি। রজমকে বাদ দিয়ে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে একেই তারা যিনার শাস্তি নির্ধারণ করল। **তাদের এহেন ঘৃণ্যকর্মের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে সূরা মায়েদার এ আয়াত নাযিল করেন,**

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

(যারা আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই প্রকৃত কাফের।) (মায়েদা- ৪৪)

মুসলিম শরীফে এসেছে,

عن نافع، أن عبد الله بن عمر، أخبره، أن رسول الله ﷺ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما

"নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার রাদি. তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যিনাকারী দুই ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আনা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন, ইতোমধ্যে ইয়াহুদীরাও এসে হাজির হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাওরাতে যিনাকারীর শাস্তি কি পেয়েছো? তারা উত্তর দিল: আমরা তাদের উভয়ের মুখ কালো করে গাধার পিঠে পরস্পরকে বিপরীতমুখী করে বসিয়ে ঘুরাই।" (সহীহ মুসলিম; কিতাবুল হুদুদ; বাবু রজমিল ইয়াহুদ।)

মুসলিম শরীফেরই আরেকটি হাদিসে এসেছে,

عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم ﷺ، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم

"হযরত বারা ইবনে আযিব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহুদীকে মুখে চুনকালী মেখে কালো করে বেত্রাঘাত করতে করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের

কিতাবে যিনার শাস্তি এমনি দেখতে পাও? তারা উত্তর দিল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের আলেমদের একজনকে ডেকে বললেন, ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যিনি মূসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এমনি দেখতে পাও? সে উত্তর দিল, না। যদি তুমি আমাকে এই কসম না দিতে তাহলে তোমাকে সত্য সংবাদটা দিতাম না। আমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি হল রজম তথা প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা। কিন্তু আমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাঝে যিনা খুব বেড়ে গেল। আমরা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ধরে ফেললে তাকে ছেড়ে দিতাম। আর কোন দুর্বল লোককে ধরতে পারলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতাম। এরপর আমরা প্রস্তাব দিলাম যে, চল আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যিনার এমন কোন শাস্তি নির্ধারণ করি যা সম্ভ্রান্ত-নিম্নশ্রেণী সকলের উপরই প্রয়োগ করতে পারবো। অত:পর আমরা রজমের বদলে মুখ কালো করা এবং বেত্রাঘাত করাকে শাস্তিরূপে নির্ধারণ করলাম।" (সহীহ মুসলিম; কিতাবুল হুদুদ; বাবু রজমিল ইয়াহুদ।)

এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াত-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

(যারা আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই প্রকৃত কাফের।) নাযিল করেন।

একটি মূলনীতি:শানে নুযূলে বর্ণিত সূরতের অনুরূপ সূরতের উপর আয়াতে বর্ণিত বিধান সুনিশ্চিতভাবে বর্তাবে।

মূলনীতিটি বুঝার জন্য একটু আলোচনার প্রয়োজন।

উপরোক্ত আয়াতে যারা আল্লাহ তাআলার বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফের। এই আয়াতের শানে নযূলে ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের কথা এসেছে যে, তারা আল্লাহ তাআলার বিধান বাদ দিয়ে তদস্থলে নিজেরাই আইন প্রণয়ন করেছিল এবং সেটা দ্বারাই বিচার ফায়সালা করত। অতএব, এ আয়াত ও তার শানে নুযূল অনুযায়ী ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা কাফের প্রমাণিত হল।

দ্বিতীয়ত: ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা যে কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের হয়েছে হুবহু ঐ কর্মে যদি অন্য কোন ব্যক্তি লিপ্ত হয় তাহলে তার বিধান কি হবে? অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার আইন বাদ দিয়ে তদস্থলে নিজেই আইন প্রণয়ন করে এবং সেটা দিয়ে বিচার ফায়সালা করে – তাহলে তার বিধান কি হবে? ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের মত সে কাফের হয়ে যাবে কি'না?

তৃতীয়ত: আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার আইন দিয়ে বিচার ফায়সালা না করবে সেই কাফের। এখন আল্লাহ তাআলার আইন দিয়ে বিচার ফায়সালা না করার বিভিন্ন সূরুত হতে পারে। যেমন- ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী আদালতের বিচারক নিম্ন বর্ণিত কারণ সমূহের কোন একটা কারণে কোন একটা মামলায় শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা না দিয়ে বরং শরীয়ত বহির্ভুত ফায়সালা দিয়ে দিল:

১. স্বজনপ্রীতির কারণে স্বজনের পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দিল অথচ ইসলামী বিধান মতে ফায়সালা স্বজনের বিপক্ষে হওয়ার কথা।

২. ঘুষ নিয়ে কোন মামলায় ঘুষদাতার পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দিল অথচ ফায়সালা তার বিপরীতে হওয়ার কথা।

৩. কোন দুনিয়াবী স্বার্থে শরীয়ত বহির্ভুত ফায়সালা দিয়ে দিল।

৪. কারো ভয়ে তার পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দিল।

৫. উপরোক্ত কোন কারণেই নয় বরং এমনিতেই শুধু খাহেশাতের অনুসরণে শরীয়ত বহির্ভুত ফায়সালা দিয়ে দিল।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র। আদালতও ইসলামী আদালত। বিচারকও ইসলাম বিচারক। তিনি সব সময় শরয়ী আইন অনুযায়ীই ফায়সালা দিয়ে থাকেন। তবে হঠাৎ কখনো কখনো উপরোক্ত কারণ সমূহের কোন একটা কারণে শরীয়ত বহির্ভুত ফায়সালা দিয়ে ফেলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার আইনকে প্রত্যাখ্যান করেননি, তদস্থলে নিজে কোন আইনও প্রণয়ন করেননি। ইসলামী আইনই তিনি মানেন। সব সময় সে অনুযায়ীই ফায়সালা দিয়ে থাকেন। কখনোও কখনোও উপরোক্ত কারণসমূহের কোন কারণে শরীয়ত বহির্ভুত ফায়সালা দিয়ে ফেলেন। এই ব্যক্তির বিধান কি? সে কি কাফের হয়ে যাবে? বাহ্যিকভাবে আয়াত থেকে তো

বুঝে আসে এই ব্যক্তিও কাফের। কারণ, সে আল্লাহ তাআলার আইন অনুযায়ী ফায়সালা দেয়নি। এখন কি সমাধান?

লক্ষ্য করুন:

উপরোক্ত আলোচনায় তিন শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

১. যাদের ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা।

২. ঐসব ব্যক্তি যারা হুবহু ঐ কাজে লিপ্ত হয় যে কাজে ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা লিপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আইন বাদ দিয়ে তদস্থলে নিজেই আইন প্রণয়ন করা এবং সেটা দিয়েই বিচার ফায়সালা করা।

৩. ঐ সব ব্যক্তি যারা ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের মত শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন করেনি, তবে উপরে বর্ণিত ৫ কারণের কোন এক কারণে কখনোও কখনোও শরীয়ত বিরোধি ফায়সালা দিয়ে দেয়।

এখানে ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের আইন প্রণয়নটা হল 'আইনু সাবাবিন নুযূল', ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের মত অন্য কোন ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন হল 'সূরতু সাবাবিন নুযূল', আর উপরোক্ত ৫ কারণের কোন এক কারণে শরীয়ত বহির্ভূত ফায়সালা দিয়ে দেয়া হল 'মা ইয়াদখুলু ফী উমুমিল লফজ'।

তাফসীরের মূলনীতি হল, আয়াতে বর্ণিত বিধান 'আইনু সাবাবিন নুযূল' এবং 'সূরত সাবাবিন নুযূল' এর উপর অবশ্যই বর্তাবে। আর 'মা ইয়াদখুলু ফী উমুমিল লফজ' এর কোনটার উপর বর্তাবে আবার কোনটার উপর বর্তাবে না।

অর্থাৎ যে ব্যক্তিদের ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তাদের উপর আয়াতে বর্ণিত বিধান অবশ্যই বর্তাবে। তদ্রূপ যাদের ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, যাদের অবস্থা হুবহু তাদের অবস্থার মত হবে তাদের উপরও আয়াতে বর্ণিত বিধান বর্তাবে। আর আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে যে সকল ব্যক্তির উপর আয়াতের বিধান বর্তাবে বলে মনে হয়, তাদের কারো কারো উপর বর্তাবে আবার কারো কারো উপর বর্তাবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعمّ الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله

"আমাদের জানা মতে উলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে এবং যে ব্যক্তির অবস্থা হুবহু ঐ ব্যক্তির মত হবে- তাদের উভয়ের উপরই আয়াতটি সমভাবে প্রযোজ্য হবে।" (আস-সরেমুল মাসলূল, পৃষ্ঠা ৩৩)

ইমাম সূয়ূতী রহ. বলেন,

فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في «التقريب»،

"সূরতু সাবাবিন নুযূলের উপর অকাট্যভাবেই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। ইজতিহাদের মাধ্যমে একে (আয়াতে বর্ণিত বিধান থেকে) বের করে দেয়া নিষেধ। কাজী আবু বকর রহ. তাঁর 'আত-তাক্বরীব' নামক কিতাবে এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।" (আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন: ১/২৮)

উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা - যাদের ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে - তারা আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়নের কারণে কাফের। তদ্রূপ যাদের অবস্থা ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের মত হবে, অর্থাৎ যারা ইয়াহুদী ধর্মগুরুদের মত শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন করে সেটাকে বিচার ফায়সালার ভিত্তি বানাবে তারাও নিশ্চিত কাফের। আর যাদের অবস্থা এমন হবে না, তবে উপরোক্ত ৫ কারণের কোন কারণে শরীয়ত বিরোধি ফায়সালা দিয়ে দেবে তারা কাফের হবে কি'না তা আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার।

বি.দ্র: ইয়াহুদী ধর্মগুরুরা শুধু যিনার শাস্তি পরিবর্তন করার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। আজ যারা শুধু একটা আইনই পরিবর্তন করেছে যে তাই নয়, বরং গোটা শরীয়তকেই শাসন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের বানানো আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করছে? এই যখন তাদের অবস্থা তখন তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে??

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০০৩

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১২ :

আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন

Ahmad Al-hindi

Member

০৬-০৬-২০১৭

আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন যে কুফরে আকবার এর অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল **সূরা তাওবার ৩৭ নং আয়াত** যেখানে আল্লাহ তাআলা জাহিলী যামানার আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়নের বিবরণ দিয়েছেন এবং সেটাকে কুফরে আকবার সাব্যস্ত করেছেন।

আরবের মুশরিকরা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যা'র বিকৃতি সাধন সত্ত্বেও আশহুরে হুরুম তথা নিষিদ্ধ ও সম্মানিত মাসগুলোর তা'জীম করত। হারাম মাস চারটি। তিনটি লাগাতার আর একটি আলাদা। লাগাতার তিনটি: ১. যিলকদ ২. যিলহজ্ব ৩. মুহাররাম। অপরটি: ৪. রজব। এ চার মাসে সব ধরণের যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা কঠোরভাবে তা মেনে চলত। তারা অতি যুদ্ধ পিপাসু জাতি হওয়া সত্ত্বেও এ চার মাসে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে জড়াত না। এমনকি কোন মুশরিক তার পিতার হত্যাকরীকে পেলেও এ মাসে তাকে কিছু না করেই ছেড়ে দিত।

এভাবে যুগের পর যুগ চলে আসছিল। এক সময় কিনানা গোত্রের **'ক্বালাম্মাস'** নামক ব্যক্তি আরবের নেতৃত্ব পায়। সে এসে প্রস্তাব পেশ করে যে, প্রতি বছর যিলকদ-যিলহজ্ব-মুহাররাম লাগাতার এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকা আমাদে জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা মুহাররাম মাসের হুরমত ও নিষিদ্ধতাকে তার পরের মাস অর্থাৎ সফর মাসে নিয়ে যাব। এবারের বছর সফর মাসকে আমরা ধরব হারাম তথা যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাস আর মুহাররাম মাসকে বানিয়ে নেব হালাল তথা যুদ্ধের অনুমোদিত মাস। এভাবে আমরা মুহাররাম মাসে যুদ্ধ করব আর তার পরের সফর মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব। তার প্রস্তাব আরবরা মেনে নিল।

পরের বছর তারা এর বিপরীত করত। অর্থাৎ ইব্রাহীমি ধর্ম মতে মুহাররাম মাস হারাম হিসেবেই বহাল থাকত আর সফর মাস যেটাকে তারা গত বছর হারাম সাব্যস্ত করেছিল এবারের বছর সেটা ধর্মে যেমন হালাল ছিল তেমন হালালই ধরা হত। এভাবে তারা আল্লাহ তাআলার হারামকৃত মাসকে হালাল আর হালালকৃত মাসকে হারাম করে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ করে নিত।

তাদের এ পরিবর্তিত রীতির ফলে বছরের হারাম মাসের সংখ্যা যদিও চারটি চারটিই থাকত কিন্তু হারাম মাস হালাল হয়ে যেত আবার হারাম মাস হালাল হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলার হারামকৃত মুহাররাম মাস হালাল হত আর হালালকৃত সফর মাস হালাল হত।

'ক্বালাম্মাস' এর মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মাঝে নেতৃত্বের ধারা চলে আসতে থাকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষ ক্বালাম্মাসের রেখে যাওয়া রীতি অনুসারে হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে থাকে। এভাবে আসতে আসতে সর্বশেষ তাদের নেতৃত্ব আসে তারই বংশধর **'জুনাদাহ্ ইবনে আউফ'** এর হাতে। তার নেতৃত্বের সময়ই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আরবরা যখন হজ্ব থেকে ফারেগ হত তখন সে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিত। রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে ধর্মের নিয়ামানুযায়ী হারাম ঘোষণা করত আর আর মুহাররাম মাসকে যুদ্ধের স্বার্থে হালাল বলে ঘোষণা দিত। মুহাররামের পরিবর্তে তার পরবর্তী সফর মাসকে হারাম ঘোষণা দিত। পরবর্তী বছর ধর্মের নিয়মানুযায়ী মুহাররামকে হারাম আর সফরকে হালাল ঘোষণা দিত।

শরীয়তের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করণের এ জঘন্য কর্মকে কুফর সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

[নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা (তাদের পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে

এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।] [তাওবা: ৩৭]

"কুফর বৃদ্ধি করে" অর্থ- কাফেররা কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে পূর্ব থেকে কাফের হয়েই ছিল। এখন হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করার দ্বারা কর্মগত কুফরে লিপ্ত হয়ে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে আরোও কুফর যুক্ত করল।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, শরীয়তের হারামকে হালাল করা কিংবা হালালকে হরাম করা কুফরে আকবার।

আল্লাম শানকীতি রহ. বলেন,

ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئاً، يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئاً يعلمون أن الله أحله، فإنهم يزدادون كفراً جديداً بذلك، مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) إلى قوله: (وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) .(الحاكمية في تفسير أضواء البيان : 18(

"শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন যে কুফরে আকবার এর অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি দলীল এই যে, কাফেররা যদি এমন কোন জিনিসকে হালাল (বৈধ) করে যার ব্যাপারে তারা জানে যে, আল্লাহ তাআলা সেটা হারাম (অবৈধ) করেছেন; কিংবা এমন কোন জিনিসকে হারাম করে যার ব্যাপারে তারা জানে যে, আল্লাহ তাআলা সেটা হালাল করেছেন- তাহলে এর দ্বারা তাদের পূর্ববৎ কুফরের সাথে আরোও নতুন কুফর বৃদ্ধি পায়। যেমনটা আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে বলা হয়েছে, **(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)** (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে)। ...

(وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না)।"
(আদওয়াউল বয়ান: তাফসীরে সূরা 'আশ-শূরা')

(এ আয়াত সংক্রান্ত বাকি আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ!)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০৪৭

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১৩

Ahmad Al-hindi

Member

০৬-০৮-২০১৭

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ليواطئوا عدة الأشهر ...

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: { إنما النسيء زيادة في الكفر} قال: النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني، كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى "أبا ثمامة"، فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما، ويحرم المحرم عاما، فذلك قول الله: { إنما النسيء زيادة في الكفر...اهـ

"মুশরিকরা তাদের নিজেদের ফাসেদ বুদ্ধি ও মতামতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার শরীয়তের উপর হস্তক্ষেপ করত। নিতান্ত খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে আল্লাহ তাআলার বিধান পরিবর্তন করত। আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তা হারাম করত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের উক্ত কৃতকর্মের নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। মুশরিকদের এ ঘৃণ্য কর্মের কারণ হচ্ছে, তাদের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধাঙ্গী মনোভাব এবং আত্মগরীমা ছিল। সুনাম সুখ্যাতির লাভের উদ্দেশ্যে অসাধ্য সাধনের প্রবণতা ছিল। যে কারণে তিন

মাস সময় তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হল। শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে মনোবঞ্চা পূরণের পথে বাধা মনে হল। ফলে তারা মুহাররাম মাসকে হালাল (যুদ্ধের অনুমোদিত মাস) বানিয়ে নিল এবং একে (অর্থাৎ এর নিষিদ্ধতাকে) পিছিয়ে সফর মাসে নিয়ে গেল। ইসলামের আবির্ভাবের এক দীর্ঘকাল পূর্বেই তারা এর প্রচলন ঘটিয়েছিল। এভাবে তারা হারাম মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম করত। তারা এমনটা করত যেন আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত ও নিষিদ্ধ মাসগুলোর সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে। ...

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে)- এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী ইবনে আবু ত্বলহা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণনা করেন যে, জুনাদাহ্ ইবনে আউফ ইবনে উমাইয়া আল-কিনানী, যার উপনাম ছিল আবু ছুমামাহ্, সে হজ্বের মৌসুমে ঘোষণা দিত, 'শোনো ওহে লোক সকল! আবু ছুমামাহ্'র কোন অন্যায়ও নেই কোন দোষও নেই। শোনো! এবারের বছরের প্রথম সফর মাস হালাল।' এভাবে সে একে লোকজনের জন্য হালাল বানিয়ে দিত। এক বছর সফর মাসকে হারাম ধরত অন্য বছর মুহাররাম মাসকে হারাম ধরত। আল্লাহ তাআলার বাণী- **(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)** (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে) এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৫০-১৫১)

ইবনে কাসীর রহ. আরোও বলেন,

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب "السيرة" كلاما جيدا ومفيدا حسنا، فقال: كان أول من نسأ الشهور على العرب، فأحل منها ما حرم الله، وحرم منها ما أحل الله، عزوجل، "القلمس"... ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام .فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا، فحرم رجبا، وذا القعدة، وذا الحجة، ويحل المحرم عاما، ويجعل مكانه صفر، ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله، يعني: ويحرم ما أحل الله.اهـ

“মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ. তার সীরাতের কিতাবে এ ব্যাপারে সুন্দর ও উপকারী আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে আরবদের মাঝে মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজটা সর্ব প্রথম করেছিল ‘ক্বালাম্মাস’। তার মৃত্যুর পর এর দায়িত্ব নেয় তার পুত্র আব্বাদ। আব্বাদের পর তার পুত্র কাল’ ইবনে আব্বাদ। তারপর তার পুত্র উমাইয়া ইবনে কাল’। তারপর তার পুত্র আউফ ইবনে উমাইয়া। তারপর তার পুত্র আবু ছুমামাহ্ জুনাদাহ ইবনে আউফ। সেই ছিল সর্বশেষ। এর সময়ই ইসলামের আবির্ভাব হয়। আরবরা তাদের হজ্ব শেষে তার নিকট সমবেত হত। সে দাঁড়িয়ে তাদের মাঝে ভাষণ দিত। রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে হারাম ঘোষণা দিত এবং মুহাররাম মাসকে হালাল ঘোষণা দিত আর সফর মাসকে এর বদলীমাসরূপে ধরত। অন্য বছর মুহাররামকে হারাম ধরত। তা এ জন্য করত যেন আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে। এভাবে আল্লাহর হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করত।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৫৩)

বি.দ্রঃ

আরবরা জানত আল্লাহ তাআলা মুহাররাম মাসকে হারাম আর সফর মাসকে হালাল করেছেন। কিন্তু তারা তাদের স্বার্থের কারণে হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করেছে। তারা এ কথা বলেনি যে, আল্লাহ তাআলাই তাদের জন্য হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে দিয়েছেন। তারা যে পরিবর্তন করেছে তাকে আল্লাহ তাআলা বা তার শরীয়তের নামে চালায়নি। বরং শরীয়তের বিধান যে এর বিপরীত তারা তা জেনে শুনেই এ পরিবর্তন করত। আল্লাহ তাআলা তাদের এ কাজকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে কোন ইশারাও নেই যে, তারা তাদের এ পরিবর্তনকে আল্লাহ বা তার শরীয়তের নামে চালাত। অতএব, সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন করাই কুফর, যদিও একে আল্লাহ বা তার শরীয়তের নামে চালানো না হয়। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ই কুফর। এরপর আর আকীদা বিশ্বাসের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। সামনে ইবনে হাজম রহ. এর বক্তব্যে তা আরোও পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০৭৪

কুফরে আমলী এবং কিছু বিভ্রান্তির নিরসন -১৪

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু ৪৫৬হি.) এর সংশয় নিরসক বক্তব্য:

Ahmad Al-hindi

Member

০৬-০৯-২০১৭

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন,

"وقال عز وجل: {إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله } ... وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره. فصح أن النسيء كفر، وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى. فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه "..اهـ

"আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেন, (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে।) ... কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধান মতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়, অন্য জাতীয় নয়। অতএব, প্রমাণিত হল মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। **অথচ তা একটা কর্ম মাত্র।** আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব, যে আল্লাহ তাআলার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা তা অবৈধ করেছেন- **সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।"** (আল-ফিছাল: ৩/২৪৫)

ইবনে হাযম রহ. এর বক্তব্যের বিশ্লেষণ:

শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কুফর এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তির আকীদা বিশ্বাস যাই হোক সে কাফের- এ ব্যাপারে ইবনে হাযম রহ. এর উপরোক্ত

বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং গুরুত্ববাহী। এ জন্য আমরা ইবনে হাযম রহ. এর বক্তব্যটাকে একটু বিশ্লেষণ করব। এতে ইনশাআল্লাহ জরুরী কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমত: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)** (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে)।

'কুফর বৃদ্ধি করে' দ্বারা কোন ধরণের কুফর বৃদ্ধি উদ্দেশ্য? কুফরে আকবার-বড় কুফর, না কুফরে আসগার-ছোট কুফর? স্পষ্টই যে, এখানে কুফরে আকবার উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা কাফেরদের উক্ত কর্মের কারণে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন কুফর যুক্ত করেছেন। স্পষ্ট যে, কাফেররা আগে থেকে যে কুফরে লিপ্ত ছিল তা কুফরে আকবার; কুফরে আসগার নয়। তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর যুক্ত হয়ে তাদের কুফরে আরোও বৃদ্ধি করেছে তা ঐ কুফরই হবে যে কুফরে তারা পূর্ব থেকে লিপ্ত ছিল। তারা কুফরে আকবারে লিপ্ত ছিল। কাজেই তাদের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর বৃদ্ধি হয়েছে তাও কুফরে আকবার। আরবী ভাষার বিধান এটাই যে, কোন কিছুর বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ঐ বস্তু যা, হুবহু একই জিনিস তাতে সংযুক্ত হওয়া।

শুধু আরবী নয়, অন্যান্য ভাষার বিধানও একই। যেমন উদাহরণ স্বরূপ: যদি বলা হয়, 'গোলায় ধান বৃদ্ধি পেয়েছে' তাহলে এর অর্থ হবে, গোলায় আগের ধানের সাথে নতুন করে আরোও ধান যোগ হয়েছে। আগের ধানের সাথে গম বা ভূট্টা মেশালে সেটাকে ধান বৃদ্ধি পেয়েছে বলা যাবে না। ধান বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই বলা হবে যখন তাতে আরোও নতুন ধান যোগ করা হবে। তদ্রূপ দুধ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ আগের দুধের সাথে নতুন দুধ যুক্ত হয়েছে। পানি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ আগের পানির সাথে নতুন করে পানি যুক্ত হয়েছে। স্বর্ণ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ আগের স্বর্ণের সাথে আরোও স্বর্ণ যুক্ত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থ আগের জনসংখ্যার সাথে আরোও জনসংখ্যা যুক্ত হয়েছে।

তদ্রূপ, কুফর বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থ আগের কুফরের সাথে নতুন কুফর যুক্ত হয়েছে। কাফেররা আগে থেকেই কাফের ছিল। এখন হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম করার দ্বারা তাদের কুফর আরোও বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করা কুফর। যদি কুফর না হত তাহলে এর

কারণে কাফেরদের কুফর বৃদ্ধি পেত না। কাজেই বুঝা গেল, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা কুফর এবং তা ঐ কুফর যে কুফরের কারণে কাফেররা আগে থেকে কাফের ছিল। কাফেররা আগে থেকে কাফের ছিল কুফরে আকবারের দ্বারা। কাজেই, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করার দ্বারা কুফরে আকবার বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা কুফরে আকবার। ইবনে হাযম রহ.তাঁর বক্তব্যের [কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধান মতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়, অন্য জাতীয় নয়। অতএব, প্রমাণিত হল মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর।] এ অংশের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই পরিষ্কার করেছেন।

শুধু ইবনে হাযম রহ. নয়, অন্যান্য ইমামগণও একই কথা বলেছেন। এটি ভাষার একটি সার্বজনীন মূলনীতি। **যেমন- ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,**

فأخبر الله أن النسيء الذي كانوا يفعلونه كفر لأن الزيادة في الكفر لا تكون إلا كفرا لاستحلالهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فكان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا بالنسيء. اهـ

“আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, মাস পিছিয়ে দেয়ার যে কাজটা তারা করত তা কুফর। কেননা, কুফরে বৃদ্ধি হবে যা দ্বারা তা কুফরই হতে হবে। আর তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হারামকে হালাল আর আল্লাহর হালালকে হারাম করত। তারা প্রথমত কুফরী আকীদা বিশ্বাসে কারণে কাফের ছিল পরে মাস পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা তাদের কুফর আরোও বৃদ্ধি পেয়েছে।” (আহকামুল কুরআন: ৪/৩০৯)

দ্বিতীয়ত: কাফেরদের মাস পিছিয়ে দেয়াটা কি? কারো কাছে অস্পষ্ট নয় যে, তা একটা আমল তথা বাহ্যিক কর্ম। আল্লাহ তাআলা এ কর্মকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। তাদের আকীদা বিশ্বাস কি ছিল সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করা হয়নি। আয়াতে আকীদা বিশ্বাসের দিকে সামান্য ইশারা ঈঙ্গিতও করা হয়নি। অতএব, বুঝা গেল মাস পিছিয়ে দেয়ার এ বাহ্যিক কর্মটিই কুফর। তাতে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে। তার আকীদা বিশ্বাস কি সেদিকে লক্ষ্য করার কোনই প্রয়োজন নেই। ইবনে হাযম রহ. এ বিষয়টিই স্পষ্ট করেছেন তারঁ বক্তব্যের নিম্নোক্ত অংশে,

[অতএব, প্রমাণিত হল মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা কর্ম মাত্র। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব, যে আল্লাহ তাআলার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা তা অবৈধ করেছেন- সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।]

সুবহানাল্লাহ! আবার লক্ষ্য করুন, [অথচ তা একটা কর্ম মাত্র।] ... [সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।] আকীদার কোন ইশারা ঈঙ্গিতও কি তাতে আছে? কেবল উক্ত কর্মটাকেই কি কুফর সাব্যস্ত করা হল না? বলা হয়নি কি যে, তাতে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে?

আশাকরি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। বিষয়টি আরোও স্পষ্ট করার জন্য আমরা সায়্যিদ কুতুব রহ., আলী ত্বনত্বাবী রহ. এবং আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করবো। ইতিপূর্বে আল্লামা শানকীতি রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করে এসেছি।

সায়্যিদ কুতুব রহ. বলেন,

فجاءت هذه النصوص تبطل النسيء وتبين مخالفته ابتداء لدين الله، الذي يجعل التحليل والتحريم (والتشريع كله) حقاً خالصا لله وتجعل مزاولته من البشر - بغير ما أذن الله - كفرا.. بل زيادة في الكفر... اهـ

“এইসব আয়াত মাস পিছিয়ে দেয়াকে বাতিল সাব্যস্ত করেছে এবং পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের গোড়ার সাথেই সাংঘর্ষিক। কেননা, আল্লাহ তাআলার দ্বীনে হালাল ও হারাম করা এবং সর্বপ্রকার আইন প্রণয়নের অধিকার শুধু আল্লাহ তাআলাকেই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার অনুমোদন ব্যতীত কোন মানুষ তাতে লিপ্ত হওয়াকে কুফর বরং কুফরের উপর কুফর সাব্যস্ত করা হয়েছে।” (ফী যিলালিল কুরআন: ৩/১৬৫১)

তিনি আরোও বলেন,

أن النسيء زيادة في الكفر. لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل الله، فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه.اهـ

"মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে। কেননা, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তার বিপরীত আইন প্রণয়ন। এতএব, তা এমন কুফর যা আকীদা বিশ্বাসগত কুফরের সাথে যুক্ত হয়ে আরোও কুফর বৃদ্ধি করবে।" (ফী যিলালিল কুরআন: ৩/১৬৫১)

আলী ত্বনত্বাবী রহ. বলেন,

إنما النسئ الذى يفعله المشركون ، من تأخيرهم حرمة شهر إلى آخر ، { زِيَادَةٌ فِي الكفر } أى : زيادة فى كفرهم؛ لأنهم قد ضموا إلى كفرهم آخر ، هو تحليلهم لما حرمه الله وتحريمهم لما أحله وبذلك يكونون قد جمعوا بين الكفر فى العقيدة والكفر فى التشريع.اهـ

"এক মাসের হুরমত তথা সম্মান ও নিষিদ্ধতাকে অন্য মাসে স্থানান্তরের যে কাজটা মুশরিকরা করত তা তাদের কুফর বৃদ্ধি করেছে। কেননা, তারা তাদের পূর্ববৎ কুফরের সাথে আরেকটা কুফর সংযুক্ত করেছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর হারামকে হালাল এবং তাঁর হালালকে হারাম করা। এভাবে তারা তাদের মাঝে দুই ধরণের কুফরের সমাবেশ ঘটিয়েছে: (এক) আকীদা বিশ্বাসগত কুফর (দুই) শরীয়ত বিরোধি আইন প্রণয়ন।" (তাফসীরে ত্বনত্বাবী: ১৮৪৭)

আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন,

وإذا كان رب العزة سمى النسيء زيادة في الكفر-النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر- فماذا نسمي الذين يسمون الجهاد جريمة قانونية يعلن عن عقوبات مرتكبيها في أجهزة الإعلام دون خشية ولا خجل ولا حياء ولا وجل؟ أليس الحكم الشرعي لهؤلاء أشد بكثير وأعظم جرما من أولئك الذين كانوا يراعون قداسة الأشهر الحرم ويراعون عدتها فلا يحلون في العدد.اهـ

“রাব্বুল ইজ্জত যখন এক মাসের হুরমতকে অন্য মাসে স্থানান্তরকে কুফরের উপর কুফর আখ্যা দিয়েছেন তখন আমরা ঐ সব লোককে কি আখ্যায়িত করবো যারা জিহাদকে আইনত দন্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করে? মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমসমূহে তাতে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ঘোষণা দেয়? তাদের না আছে কোন ভীতি, না আছে কোন অনুতপ্ততা! না আছে কোন লজ্জা-শরম, আর না আছে কোন ব্যথা! শরীয়তে কি এদের বিধান ঐ সব মুশরিকদের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর এবং এদের অপরাধ তাদের চেয়ে অনেক জঘন্য হবে না, যারা আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোর সম্মান রক্ষা করত এবং সেগুলোর সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখত, যার ফলে সংখ্যায় কোন পরিবর্তন করত না??” (জিহাদু শা’বিন মুসলিম: ১/৩৪)

নিশ্চয়ই এদের অপরাধ ঐ সব মুশরিকদের চেয়ে জঘন্য এবং অবশ্যই শরীয়তে এদের বিধান তাদের চেয়ে কঠিন!

***

বি.দ্র.: ইসতিহলাল বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে।

উপরোক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল ‘ইসতিহলাল’ তথা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা (অন্য ভাষায় একে ‘তাহলীল’ ও ‘তাহরীম’ও বলা হয়) আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন হতে পারে, শুধু বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে। এ উভয়টাই কুফর। অতএব, কোন ব্যক্তি কোন অকাট্য হারামকে হালাল কিংবা কোন অকাট্য হালালকে হারাম মনে করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আইন প্রণয়ন করে তার বৈধতা দিয়ে দিলে কিংবা তাকে অবৈধ ঘোষণা করলেও কাফের হয়ে যায়।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০৯৭

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ (১-৮)

Abu Khubaib

Senior Member

০৮-১৯-২০১৭

(নতুন পর্ব আসামাত্র আপডেট হবে ইনশা'আল্লাহ)

বাংলাভাষী আলেমদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাম ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির।
সুবক্তা, সুলেখক হিসেবে পরিচিত, আস-সুন্নাহ ট্রাস্টের সাবেক কর্ণধার আল্লাহ'র ইচ্ছায় কিছুদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা উনাকে ক্ষমা করুন। আমীন।*

মরহুম শায়খের লেখা "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" বইটি জামাতপন্থী, আধুনিক মানসিকতার মুসলিম ও কিছু নব্য ইরজাগ্রস্ত সালাফি ভাইদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় ও রেফারেন্স বুক হিসেবে প্রসিদ্ধ।

শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই এই বইয়ে শায়খ কর্তৃক উল্লেখিত কিছু তথ্যগত ও ইলমি ত্রুটি-বিচ্যুতি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ মুসলিমেরা বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।*

মরহুম শায়খকে হেয় করা কারো উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই।*
আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতিটি কাজ ইখলাসের সাথে আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।*

খন্দকার জাহাঙ্গির রহঃ'র লিখিত বইয়ের ফিতনার ব্যাপারে লেখালেখির জন্য অনেক ভাইয়ের থেকে দু'আ ও ভালোবাসা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্* তা'আলা যেন এর বিনিময়ে আমাকে মাফ করেন। নতুন লেখা সময়-সুযোগের অভাবে না লিখতে পারলেও পূর্বের ৬টি লেখা একত্রে দেয়া হলো যাতে ভাইয়েরা সহজে পড়তে ও শেয়ার করতে পারেন।*

আজ দেখলাম, খন্দকার রহঃ'র এক ভক্ত ভাইয়ের মতে জনৈক জিহাদির মাথা নাকি ভনভন করে ঘুরতে থাকে খন্দকার রহঃ'র বই পড়ে...

পূর্বে আমার এক ভাই জানালেন, খন্দকার রহঃ'র মুরিদেরা আমার পর্যালোচনা পড়ে আমাকে তাকফিরি-খাওয়ারিজ/ ইহুদিদের দালাল ট্যাগ লাগিয়েছেন যথাযথ জবাব দেয়ার পরিবর্তে... তথাপি, সত্য তো বলতেই হবে... ফি সাবিলিল্লাহ...

এই সিরিজের লিখা পড়ে দুই একজন যদি এই দিক থেকে ফিরে আসতে পারেন তবে ততটুকুই ভালো। . তাও যদি না হয় তবে আমার সন্তান-পরিবার-আত্মিয়-পরিচিতদের কেউ যেন মুরজিয়াবাদের ফাদে না পড়েন এর জন্য লিখা। আল্লাহ্ সহজ করুন। আমিন।*

১ম পর্বঃ

বইটির ভূমিকায় মরহুম লেখকের (ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির) শ্বশুর ফুরফুরা পীর সাহেব লিখেছেন,

"বিড়ালকে অভুক্ত বেঁধে রাখার জন্য কঠিনতম নিন্দা জানিয়েছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের কেউ ইসলামের নামে মানুষ খুন করতে পারে একথা কল্পনাও করতে পারি না।" (ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃষ্ঠা ৩)

আল্লাহ্* তা'আলা বলেন,

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সুরা তাওবা: ৫]

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।" [সুরা বাকারাঃ ২১৬] .

উপরোক্ত আয়াত দুটি ছাড়াও কুর'আনের কয়েক'শ আয়াত ও সহস্রাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত শুধুমাত্র ইসলামের নামেই মানুষ হত্যা করা জায়েজ বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ফরজ ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আমিরুল ইত্তিহাদ এটা জানবেন না, এটা মনে করা উনার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা বৈ অন্য কিছুই নয়।

ধরে নেয়া যাক, উনি 'ইসলামের নামে খুন' বলতে কুর'আনের আয়াত ও হাদিসের ভুল ব্যখ্যা করে অন্যায়ভাবে শারিয়া বহির্ভূত হত্যা করাকে বুঝিয়েছেন।

কিন্তু দেখুন, সাধারণভাবে উনার এই কথা আম মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারে যে, ইসলামে হত্যা বলতে কিছুই নেই।

উনার এই উক্তিটি ভুল হিসেবে উল্লেখিত করা হচ্ছে না। বরং, ইসলামে হত্যা বলতে কিছুই নেই এমন চুড়ান্ত ভ্রান্ত ধারণা যাতে সাধারণের মস্তিস্কে ঠাই না পায় তা পরিষ্কার করাই ছিল উদ্দেশ্য।

কেননা কোনো ব্যক্তি যদি শুধু যুদ্ধ ও হত্যা সংক্রান্ত আয়াত/হাদিস সামনে এনে ঘোষণা দেয় যে, "ইসলামে ক্ষমা ও শান্তি বলে কিছু নেই, আছে শুধু যুদ্ধ"!

তবে কি তাঁকে ভ্রান্ত বলা হবে না?

একজন 'স্বনামধন্য' আলেম ও উনার গুনমুগ্ধ অনুসারীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে সাধারণ মানুষের কাছে বক্তব্য তুলে ধরার সময় শারিয়াহ'র কোনো আহকামের ব্যাপারে যাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে।

২য় পর্বঃ

আলহামদুলিল্লাহ! মরহুম শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির "ইসলামের নাম জঙ্গিবাদ" নামক বইয়ের প্রথম পরিচ্ছদে (পরিচিতি ও আলোচিত কারণ) শুরুর দিকে সন্ত্রাসের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ ও মুসলিম দেশসমূহের উপর মার্কিন-ইজরায়েলি আগ্রাসনের ব্যাপারে চমৎকার কিছু আলোচনা করেছেন।

এবং প্রমাণ করেছেন, সন্ত্রাসের সংজ্ঞা একেক জনের কাছে একেক রকম। যেমন—ইজরায়েলিদের কাছে ফিলিস্তীনিরা সন্ত্রাসী, আবার ফিলিস্তীনিদের কাছে ইজরায়েলিরা সন্ত্রাসী।

পৃষ্ঠা ৯ এ ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেছেন,

"এভাবে আমরা দেখছি যে, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এবিষয়ে ঐক্যমত পোষণ প্রায় অসম্ভব।"

একটু নিচে তিনি আবার একটি প্রবাদ উল্লেখ করে উনার বক্তব্যের সারাংশ টেনেছেন,

"One man's terrorist is another man's freedom fighter".

আলেম কেন, একজন মুসলমানের কাছেও তো আমাদের দাবী তো এই যে, তার কাছে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার মানদন্ড হবে আল্লাহ্* সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব। যা শারিয়াহ'র পরিভাষায় আল-ওয়ালা ওয়াল বা'রা হিসেবে অভিহিত।

কিন্তু একজন আলেম হয়েও তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর সংজ্ঞা আপেক্ষিক।

অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রকৃত সন্ত্রাসী/অপরাধী কারা এবং ন্যায়সঙ্গত মুসলিমদের সাথে তাদের আচরণ কেমন হয়/হবে তা বারংবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন,

"তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়।" [সূরা বাকারা ২:২১৭]

"এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে সেখানকার অপরাধী প্রধানদেরকে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি।" [সূরা আন'আম ৬: ১২৩]

"যারা অপরাধী তারা তো মু'মিনদেরকে উপহাস করত।" [সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩:২৯]

"ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের স্মরণাপনড়ব হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" [সূরা মু'মিন ৪০:২৬]

“তারা বললঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ নিচু শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে।” [সূরা শূরা ২৬:১১১]

“তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বললঃ ‘তোমরা যদি শুআ’ইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্থ হবে’।” [সূরা আ’রাফ ৭:৯০]

“ফিরাউন বললঃ আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তাই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।” [সূরা মু’মিন ৪০:২৯]

“কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করব।” [সূরা ইব্রাহীম ১৪:১৩]

কিন্তু! অজ্ঞাত কারণে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর সংজ্ঞায়নে কুর’আনকে সামনে আনেন নি। মানদন্ড হিসেবে বইয়ের পরবর্তী অংশে কুর’আন ও সুন্নাহ’র আংশিক আলোকপাত থাকলেও মূল প্রশ্নে কুর’আন-সুন্নাহ থেকে একটি অক্ষরও উল্লেখিত হলো না। কেন? ওয়াল্লাহু আ’লাম।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কুর’আনে পরিষ্কার করেছেন সামগ্রিকভাবে কুফফার ও মুসলিমরা ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনা।

“’আর আল্লাহ চাইলে তিনি তাদের এক উম্মত বানিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ কৃপার অন্তর্ভুক্ত করেন।“ (সুরা আশ শুরা : ৮)

“ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা কখনই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীনের অনুসরণ কর।“ [সূরা বাকারা : ১২০]।।।

এই আয়াত দুটি এত বড় আলেমের জানা থাকারই কথা। প্রশ্ন হচ্ছে এমনটা জানার পরও ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ‘সন্ত্রাস’ ও ‘সন্ত্রাসী’ চিহ্নিতকরণে ঐক্যমত কেন খুজলেন?

এছাড়াও প্রশ্ন থেকে যায় শার’ঈ আলোচনা করা হয়েছে এমন একটি বইয়ে শ্রদ্ধেয় শায়খ কুর’আনের আয়াতের ব্যবহার না করে শুধুমাত্র নামসর্বস্ব কিছু উক্তি ও তথ্যের আলোকে কেন এই চিরন্তন সত্যটি কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন করে প্রমাণ করতে চাইলেন?

যদি এমন হতো যে বইটি অমুসলিমদের জন্য লেখা . এবং তাদের জন্য কুর'আন-সুন্নাহ থেকে কোনো উদ্ধৃতি চয়ন করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন তাহলে কোনো প্রশ্ন থাকতো না। অথচ, বইয়ের পরবর্তী অংশে তিনি অসংখ্য শার'ঈ নুসুস, সালাফদের মতামত ও ইসলামী ইতিহাসের খুটিনাটি তুলে ধরেছেন।

সম্পূর্ণ ১.১.১ অধ্যায় পড়ার পর সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিবে যে তিনি আসলে, সাম্রাজ্যবাদী ও 'মৌলবাদী' উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন। উভয়কেই সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করেছেন। 'সন্ত্রাস' ও 'সন্ত্রাসী' চিহ্নিতকরণে ডক্টর সাহেব যদি একটি কুরআনের আয়াতও মানদন্ড হিসেবে উল্লেখ করতেন তবে পাঠকের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ও মৌলবাদী উভয়পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যেত না, অন্তত পাঠকদের বড় একটি অংশের কাছে।

বাস্তবতাও তাই! জ্ঞানের ভারে ন্যুব্জ শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সুপাঠ্য লেখা পড়তে পড়তে পরিচ্ছদ শেষে পাঠকের অবচেতন মন হয়েছে প্রভাবিত। ওয়াল্লাহু 'আলাম।

৩য় পর্বঃ

পৃষ্ঠা ৯ এর মাঝামাঝি শায়খ (আল্লাহ্* তা'আলা উনাকে মাফ করুন) উল্লেখ করেছেন,

"ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধা বা শিয়া-সুন্নি সঙ্ঘাতে লিপ্ত বিভিন্ন দল নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষদের হত্যা করলে তাকে সকলেই সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন। কিন্তু মার্কিন বাহিনী ফালুজা এবং অন্যান্য স্থানে অযোদ্ধা নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যা করলে তাকে সন্ত্রাস বলে কখনোই স্বীকার করা হয় না।"

প্রথমত, ২০০৩ সালে মার্কিন-ন্যাটো জোট বিনা উস্কানিতে ইরাক আক্রমণ করে। এর পেছনে কোনো প্রকার 'জঙ্গিবাদী' উস্কানি ছিল না। সাদ্দাম হোসেন পরবর্তী সময়ে রাফেজি দালাল নুরি আল মালিকিকে ক্ষমতায় বসায় মারকিন-ন্যাটো নীতিনির্ধারকরা যাদের নির্দেশে ইরাকের আহলুস সুন্নাহ ও মুজাহিদিনদের উপর আগ্রাসন চালায় রাফেজি সৈন্যবিশিষ্ট ইরাকি আর্মি।

ইরাকের যুদ্ধ ছিল মার্কিন-ন্যাটো জোট ও তাদের সৃষ্ট পুতুল ইরাকি আর্মির বিরুদ্ধে। এটা কখনোই নিছক 'শিয়া-সুন্নি সংঘাত' ছিল না।

উনি নিজেও ইতোঃপূর্বে ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করেছেন! কি নিদারুণ স্ববিরোধীতা!

"তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।"—সুরা আন-নামল, ২৭ঃ৬৪

ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর মুসলমানদের রক্তের ব্যাপারে চরম ঔদাসিন্য দেখিয়েছেন। যদি উনার জানার সল্পতা থাকত উনি কেন এটা লিখতে গেলেন?

আর যদি জেনেশুনে এভাবে নিহত মুসলমান ও সম্ভ্রমহারা বোনদের গায়ে এমন অপবাদ দিয়ে থাকেন তবে আল্লাহ্* তা'আলা যেন উনার ফয়সালা তদানুজায়ী করেন।

সুবহান'আল্লাহ! ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে নিহত হয় দশ লক্ষাধিক নিরীহ বেসামরিক মানুষ। মাহমুদিয়া গ্রামে ১৪ বছরের বোন আবির আল জানাবি (রাহিমাহুল্লাহ) কে ধর্ষণের পর গোটা পরিবারসহ জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা জানে না এমন কে আছে?

বিশেষ করে দুনিয়ার এত খবর রাখা, বৈশ্বিক 'জঙ্গিবাদের' উপর বই লেখা একজন ব্যাক্তি তা জানবে না এটা কিভাবে সম্ভব??

এত কিছুর পরও উনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

তবে উনার কাছে কঠিন মনে হলেও পরবর্তীতে উনি সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছেন।

অথচ লক্ষ লক্ষ মুসলমানের রক্ত ঝরানো, আবু গারিব কারাগারে সম্ভ্রান্ত-রক্ষনশীল মুসলিম বোনদের দৈনিক দশবার ধর্ষণ করা সত্ত্বেও উনি আমেরিকানদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করাকে খুবই কঠিন মনে করছেন।

জঙ্গি-সন্ত্রাসী শব্দের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেস্টায় যদিও তিনি দেখিয়েছেন কাউকে 'সন্ত্রাসী' বা 'জঙ্গি' আখ্যায়িত করাটা কঠিন; তথাপি তিনি হঠাৎ করেই যেন জঙ্গি

কারা তা খুজে পেয়েছিলেন এবং পরবর্তী পরিচ্ছদগুলোতে অবলীলায় 'জঙ্গি' শব্দের ব্যবহার করেছেন।

৪র্থ পর্বঃ

মরহুম শায়খ পৃষ্ঠা ৯ এর শেষে উল্লেখ করেছেন

"যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয়পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতিসঞ্চারে সচেষ্ট থাকে। তবে সন্ত্রাসের সাথে যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেরই যোদ্ধারা মূলত যোদ্ধা বা যুদ্ধবিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রের সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না।

এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যেই হলো সামরিক-অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।"

বরাবরের মতই মরহুম শায়খ পূর্বের লাইনের সাথে পরের লাইনের সামঞ্জস্য দেখাতে পারেন নি। অধমের কাছে বোধগম্য নয়, শায়খ শুরুতে বললেন সন্ত্রাসী/সন্ত্রাস কাদের/কাকে বলা হয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

কিন্তু এই প্যারাতে দেখা যাচ্ছে যে, শায়খ খুজে পেয়েছেন। কিভাবে, কোথা থেকে উল্লেখিত তাও পরিষ্কার করা হয়নি। কিন্তু শায়খ এখানে একটি সংজ্ঞায়ন করেছেন, যদিও এটার কোনো সুত্র উনি উল্লেখ করেন নি।

স্পষ্টতই কুর'আন-সুন্নাহ'র আলোকে এই সংজ্ঞাটি সনদের ক্ষেত্রে সদা সতর্ক শায়খ দেন নি। তাই এই সংজ্ঞাটি উনি কোথা থেকে পেলেন তা স্পষ্ট নয়। সুবহান'আল্লাহ! আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা ১/২ লাইনের মারপ্যচেই পাঠককে বিভ্রান্ত করা হয়। বিশেষ করে যে বই ভ্রান্তির উপর লিখিত, সে বইয়ের প্রতিটি লাইন কখনোই প্রমাণিত করা সম্ভব না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমি পাঠকদের মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণের আহ্বান জানাব তা হচ্ছে, আল্লাহ্* তা'আলার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন?

রাষ্ট্রের ধারণাই তো তৎকালীন সময়ে এত ব্যাপকভাবে ছিল না।

বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আচরণ অবশ্যই হাদ্দ কিংবা ক্বিসাস নয়। কেননা তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যাক্তি এবং নারী ছাড়া বাকী সবাই অবশ্যই যুদ্ধে শরিক হয়নি। এবং তাদেরকে যুদ্ধ চলাকালীনও হত্যা করা হয়নি।

শায়খের সংজ্ঞানুযায়ী একে কোনোভাবেই যুদ্ধ বলা যায় না।

শায়খ প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী একে যদি কিছু বলতে হয় তবে 'সন্ত্রাস'ই বলতে হয়। লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ্* তা'আলা শায়খকে ক্ষমা করে দিন। আমীন।

এছাড়াও আরও তিনটি বিষয় আলোচনা করা হলো –

১/ স্ববিরোধী বক্তব্যঃ শায়খ লিখেছেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয়পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতিসঞ্চারে সচেষ্ট থাকে।

আবার নিচে লিখেছেন, পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রের সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যেই হলো সামরিক-অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

সৈন্য ও নাগরিক দ্বারা কী উদ্দেশ্য? স্বাভাবিকভাবেই এটা বুঝে আসে যে, সৈন্য হচ্ছে সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিক হচ্ছে বেসামরিক ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও, শায়খ এখানে "এবং" অব্যয় ব্যবহার করেছেন যা দ্বারা স্পষ্টতই বুঝে আসে যে, যুদ্ধে বেসামরিকদের আক্রমনও করা হয় ভীতিসঞ্চারের উদ্দেশ্যে।

পরবর্তী বক্তব্যের সাথে তাই সংঘর্ষ হচ্ছে। কেননা সন্ত্রাসের উদ্দেশ্যও সামরিক-বেসামরিকদের মাঝে ভীতিসঞ্চার করা।

বাকী থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার বিষয়টি। এমন কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে রয়েছে কি, যে বলবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা নয়?

মূলতঃ এই স্পষ্টতই স্ববিরোধী বক্তব্য থেকে বুঝে আসে যে, মরহুম শায়খ শুধুমাত্র কলম চালিয়েছেন এবং উনার গুনমুগ্ধ ভক্তরা শুধু পড়েই গিয়েছেন। যাচাই-বাছাই কিংবা সত্যানুসন্ধানের মেজাজ লেখক-পাঠক উভয়ের মাঝেই ছিল অনুপস্থিত।

২/ সন্ত্রাসের অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাঃ

যে ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে খুন করে তাকে কি আমরা সন্ত্রাসী বলি না?

ছিনতাইকারী/চাঁদাবাজদের কে কি সন্ত্রাসী বলা হয় না?

যদি এদের সন্ত্রাসী বলা হয়, তাহলে পাঠকের কাছে প্রশ্ন থাকে—টাকার বিনিময়ে খুন করা কিংবা ছিনতাই করার মাঝে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিভাবে হাসিল হয় !?!

অর্থাৎ, সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ। বেখেয়াল ব্যক্তি কিংবা শায়খের গুনমুগ্ধ পাঠকমাত্রই বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন।

কিন্তু এমন প্রশ্ন তো আসাটা একেবারেই স্বাভাবিক ছিল যে, কেন শায়খ কুর'আন-সুন্নাহ'র চিরন্তন মানদন্ডকে বাদ দিয়ে জোর করে এমন একটি সংজ্ঞা দাড় করাতে চাইলেন যে সংজ্ঞায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিমদের সন্ত্রাসীরূপে চিত্রায়িত করা যায়?

৩/ একচোখা বিশ্লেষণঃ

শায়খ বলেছেন,

"সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেরই যোদ্ধারা মূলত যোদ্ধা বা যুদ্ধবিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে।"

যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, যে কোনো দল কিংবা সামরিক শক্তি অবশ্যই প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার চেষ্টায় থাকে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তানজিম আল-কায়দা থেকে শুরু করে গোটা দুনিয়াতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট-মাঝারি-বড় সকল দলেরই উদ্দেশ্য থাকে সামরিক বিজয়।

শায়খ যদি বলেন যে, এদের সামরিক বিজয় অর্জন করা লক্ষ্য নয় তবে, আফগানিস্তান-সিরিয়া-সোমালিয়া-মালি-ইয়েমেনেসহ অন্যান্য জিহাদি মারেকাগুলোর দিকে পাঠকদের সজাগ দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানাচ্ছি, যা শায়খের উক্ত বক্তব্যের অসারতা স্পষ্ট করে তুলবে।

সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে শায়খ বলেছেন, এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যেই হলো সামরিক-অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস অধ্যায়ন করতে। কেননা এদুটো শুধু যুদ্ধ হিসেবেই স্বীকৃত নয়, বরং বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত। দুটি যুদ্ধেই গণহারে নিহত হয়েছে কয়েক লক্ষ বেসামরিক ব্যক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু বেসামরিক ইহুদিই হত্যা করা হয়েছে ছয় মিলিয়ন।

নিঃসন্দেহে বিশ্বযুদ্ধগুলোতে সামরিক ব্যক্তির চেয়ে অনেকগুন বেশী বেসামরিক ব্যক্তি আক্রমণের শিকার হয়েছে। জাপানে আণবিক বোমার মাধ্যমে আমেরিকা হত্যা করেছে কয়েক লক্ষ জাপানি। যাদের প্রায় সবাইই ছিল বেসামরিক।

এছাড়াও নানকিং ও জাপানি গ্রামগুলোতে মিত্রবাহিনীর গনধর্ষণের কথা তো রয়েই গেলো। এখন, প্রশ্ন থেকে যায়—ইতিহাসের বইগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কী হিসেবে উল্লেখিত? সন্ত্রাস নাকি যুদ্ধ?

অবশ্যই এখানে নির্বিচার হত্যার পক্ষে সাফাই গাওয়া হচ্ছে না। মূলতঃ সন্ত্রাস ও যুদ্ধের সংজ্ঞায়নে মরহুম শায়খের বিশ্লেষণের ফাঁক তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

উপরন্তু দেখুন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শান্তিকামী আমেরিকা এবং তার মিত্ররা মাত্র কয়কে বছরে ৪০ লক্ষ মুসলিম হত্যা করেছে। এবং এখনো চলছ। একেও বলা হচ্ছে যুদ্ধ। সন্ত্রাস বলা হচ্ছে না।

এর আগে নব্বইয়ের দশকে আমেরিকা কর্তৃক ইরাকের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে অনাহারে মারা যায় প্রায় ১০ লক্ষ মুসলিম শিশু ‘সন্ত্রাসী। কিন্তু একেও তো বলা হয় উপসাগরীয় যুদ্ধ। সন্ত্রাস তো বলা হচ্ছে না।

সিরিয়াতে রাশিয়া, তুরস্ক, আমেরিকা গণহারে এয়ার রেইডের মাধ্যমে সহস্রাধিক নারী-শিশু হত্যা করছে।

ইয়েমেনে আরব আমিরাত, সৌদি আরব হত্যা করেছে কয়েক হাজার আহলুস সুন্নাহ’র মুসলমান। ইয়েমেনে একদিনেই এক বিয়েবাড়িতে সৌদি জঙ্গি বিমানের আক্রমণে শহিদ হয় ১৫০’র মত মুসলমান !!

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, কেন এটা 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' হয় না!??!

দেখুন, পশ্চিমাদের সন্ত্রাস/সন্ত্রাসীর সংজ্ঞায়ন দ্বারা মরহুম শায়খ প্রভাবিত হয়েছেন কি না? (যদিও, কয়েক লাইন পরেই উনি অবশ্য সরাসরি পশ্চিমা সংজ্ঞা উদ্ধৃতি করে তার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করেছেন।)

উনি পূর্বে লম্বা আলোচনা করে দেখালেন সন্ত্রাসের যথাযথ সংজ্ঞায়ন সম্ভব নয়, অথচ পশ্চিমারা মুসলিম রক্তপ্রবাহের গ্রহণযোগ্যতা আদায়ে সন্ত্রাসের যেভাবে সংজ্ঞা দিয়ে থাকে দুঃখজনকভাবে তিনিও একই সংজ্ঞা দিয়ে দিলেন... উদ্দেশ্য আশা করি পাঠকের কাছে স্পষ্ট।

মরহুম শায়খের এই সংজ্ঞায়নের উপরই বইয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। অথচ উনার সংজ্ঞায়নের বিশ্লেষণ হয়েছে কাফিরদের সন্ত্রাস হাল্কাভাবে নেয়া ও মুসলমানদের সন্ত্রাসী প্রমাণ করার একচোখা নীতির উপর।

ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৫ম পর্বঃ

শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির বলেন,

"মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ,বিষপ্রয়োগ কখনোই তিনি করেন নি বা করার অনুমতি দেন নি।"

— ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃষ্ঠা ৪৯

১) হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদিঃ বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ফিলিস্তিনের উবনা এলাকার উপরে ভোরে আক্রমন করে তাদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দেবার আদেশ দিলেন এবং বললেন,"আল্লাহ'র নামে রওনা হয়ে যাও।"
(মুখতাসার ইবনে আসাকির, হায়াতুস সাহাবা, ২/৪৭) . .

২) চতুর্থ হিজরীর মহররম মাসে খালিদ বিন আবু সুফিয়ান হুজালি মুসলিমদের উপর হামলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে জানার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিঃ খালিদ বিন আবু সুফিয়ান হুজালিকে গুপ্তহত্যা করেন এবং তার মাথা কেটে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুপ্তহত্যাকারী সাহাবিকে একটি লাঠি দিয়ে বলেন, "কিয়ামতের দিন এটি তোমার ও আমার মাঝে নিদর্শন হিসেবে থাকবে।" (যাদুল মা'আদ, ২/১০৯; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৬১৯-৬২০) . .

৩) রাসুলুল্লাহ (সা) এর সময়ে 'বায়াত' নামক এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি ছিল। এটা ছিল রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষের উপর হামলা করা। আক্রমণকারীরা অতর্কিতভাবে শত্রুদের বাড়িঘরে কিংবা তাবুতে হামলা করত এবং লড়াইয়ে লিপ্ত হত।

এ কারণে ঘরে কিংবা তাবুতে অবস্থানরত নারী-পুরুষ- শিশু নির্বিশেষে নিহত হত কারণ এর মাঝে নারী-পুরুষ-শিশু পার্থক্য করা খুবই কঠিন। এখন, এ ধরণের যুদ্ধ কি ইসলাম অনুমোদন করে? . 'বায়াত' যুদ্ধে নারী-শিশুরা যে হামলার শিকার হচ্ছে এ ব্যপারে রাসুলুল্লাহ(সা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

একটি সহিহ বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত"। (সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ হত্যার অনুমতির ব্যাপারে যুদ্ধরত পুরুষদের উপর যে হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের এই ধরনের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন যেখানে পুরো পরিবারই নিহত হচ্ছে। সালামাহ(রা) বলেছেন 'আমি নিজে নয়টি পরিবারের সকল লোককে হত্যা করেছি।' . (আল-তাবারানি) . . ৪)

ইবনে রুশদ বলেন, এই ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা আছে যে কাফেরদের দুর্গে গুলতি দিয়ে আক্রমন করা বৈধ যদিও তাদের মাঝে নারী –শিশু থাকুক কিংবা না থাকুক।

কারণ আমাদের নিকট দালিল আছে যেখান থেকে জানতে পারি রাসুল (সা) তায়িফে কাফেরদের বিরুদ্ধে গুলতি ব্যবহার করেছিলেন।

(বিদায়াত আল-মুজতাহিদ) . .

আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে এখানেই থামা হলো। খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গিরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। উনার বইয়ের বিকল্প বই পাওয়া গেলে উনার বই বিতরণ, ক্রয়, পঠন ত্যাগ করাই উত্তম... . .

আল্লামা মুহাম্মাদ ইব্ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

"অতএব পরখ করে দেখো কার থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো!" (শামায়েলে তিরমিজির শেষ হাদিস, মাওকুফ)

পর্ব ৬ঃ

খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রহঃ পৃষ্ঠা ৪৯ এ লিখেছেন-

রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: **الإمام جنة يقاتل من ورائه** "রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।" (ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃষ্ঠা ৪৯)

প্রথমত, হাদিসের অর্থ বিকৃত করেছেন- . ইমাম শব্দের শাব্দিক অর্থ নেতা। হাদিসের অর্থ এভাবে পরিবর্তন করা অনুচিত। নিশ্চয়ই সালাতের ইমাম বলতে, হাজ্জের ইমাম বলতে আমরা সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধান বুঝে থাকি না!

উনি হাদিসের অর্থ লিখে অতঃপর ব্যখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু ইমাম শব্দের অর্থ রাষ্ট্রপ্রধান কখনই হয় না। নিচে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে... . . দ্বিতীয়ত, তিনি বলে দিচ্ছেন অবলীলায় যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিহাদের বৈধতার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে শর্ত হিসেবে বুঝিয়েছেন এই হাদিসে!! .

কোথায় পেলেন এই শর্ত!! কোথায়? কোন ফিকহের কিতাব?

কোন মুহাদ্দিস এই কথা বলেছেন!! রাষ্ট্রপ্রধান শব্দটি কোথায় আছে!!?? . .

এগুলো আল্লাহ্*'র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই না... কারণ হুবহু একই শব্দ এসেছে আরেকটি হাদিসে...

. সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ

وفي صحيح مُسْلِم عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً، وإذا قَالَ :سَمِعَ الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لَكَ الحمد .

অর্থাৎ, 'ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরুপ। যদি তিনি বসে নামাজ পড়েন, তবে তোমরাও বসে নামাজ পড়ো। যখন তিনি বলেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ', তখন তোমরা বলোঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্*'।

একইভাবে জাবির (রাঃ) থেকে ইমাম দারাকুতনী (রঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেনঃ

إنما الإمام جنة فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا - أخرجه الدارقطنى . . (1/423)

অর্থাৎ, 'ইমাম ঢাল স্বরুপ, যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন, তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়ো। যখন তিনি বসে নামাজ পড়েন তখন তোমরা বসে নামাজ পড়ো'। .

কে আছে বলবে...

...এই হাদিস দুটিতে কি রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত বোঝানো হয়েছে?

...এখন কি দাঁড়িয়ে নামাজের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে?

...এখন কি বসে নামাজের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে?

...এখন কি নামাজে 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্*' বলার জন্য কেউ রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে? . আজব যুক্তি! আজব দলীল! আজব ফিকহ!!

— —

খ) জনৈক কল্যাণকামী ভাই বিপরীতে দেখিয়েছিলেন বিভিন্ন মুহাদ্দিস 'ইমাম' অর্থ রাষ্ট্রপ্রধান দেখিয়েছেন। তাই হাদিসের অর্থে ইমাম অর্থ রাষ্ট্রপ্রধানকেই খাস করে কোনো ভুল করা হয়নি।

যদিও জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান জরুরী এই অদ্ভুত শর্তারোপ করা হয়েছে।

আমরা জানি যে, ইমাম অর্থ নেতা যা একটি ব্যাপক শব্দ। যার মানে –

খলিফা, সফরের ইমাম, সালাতের ইমাম, হজ্জের ইমাম, জিহাদের ইমাম, রাষ্ট্রের ইমাম অনেক কিছুই হতে পারে।

তাই উক্ত হাদিসের ইমাম অর্থ রাষ্ট্রপ্রধানই হবে অন্য অর্থ হবে না এটা ভুল। কারণ ঐ হাদিসের ব্যখ্যায় কেউ রাষ্ট্রপ্রধানও করেছেন আবার কেউ খলিফাও করেছেন।
অথচ সকল রাষ্ট্রপ্রধান খলিফা নয়।

আর- শায়খ আলবানির মতে জিহাদের জন্য খলিফা শর্ত। শুধু রাষ্ট্রপ্রধান হলেই হবে না। (দেখুন- ফিতনাতুত তাকফির)

অর্থাৎ, ইমাম অর্থ রাষ্ট্রপ্রধাণের আলোচনা মুহাদ্দিসিনরা আমভাবে করেছেন। খাসভাবে ঐ হাদিসের ইমাম বলতে শুধু খলিফাই হবে এমন না।

এমন খাসভাবে অর্থ নিয়ে নিলে তো সৌদির 'জিহাদ', সাইয়েদ আহমাদ শহিদের জিহাদ (যেসব জিহাদকে খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রহঃ নিজেও জিহাদ মনে করেন, সন্ত্রাসী না) সবই সন্ত্রাস। এবং শায়খ রহঃ নিজেও সন্ত্রাসের উস্কানিদাতা হিসেবে পরিগণিত হোন। আল্লাহ সহজ করুন।

এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল,

একটি হাদিসের অর্থ এভাবে খাসভাবে রাষ্ট্রপ্রধাণ সাব্যস্ত করে জিহাদের জন্য রাষ্ট্রের শর্ত আরোপ করা উচিৎ হয়নি।

কেননা ইমাম শব্দটি কখনো কখনো সেনাপতির ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে পারে। দেখুন নিম্নোক্ত হাদিসটি যা উল্লেখ করেছেন ইমাম হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে,

الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله و #أطاع_الإمام و أنفق الكريمة و ياسر الشريك و اجتنب الفساد فإن نومه و نيهه أجر كله و أما من غزا فخرا و رياء و سمعة و عصى الإمام و أفسد في الأرض فإنه لن يرجع بكفاف

(সনদঃ মুসলিমের শর্তে সহিহ)

ব্যখ্যায় **أطاع الإمام** ব্যাখ্যায় ইমামের অর্থ এসেছে "যার আদেশ মানা হয়।"

(التنوير شرح الجامع الصغير)

এখানে বাহ্যত বোঝাই যাচ্ছে যে, এখানে ইমাম বলতে যুদ্ধের ইমাম তথা সেনাপতির কথা বলা হচ্ছে।

না বুঝে থাকলে হাদিসের প্রথম অংশ দেখা উচিৎ।

হাদিসটির শুরুতেই বলা হয়েছে **الغزو غزوان** অর্থাৎ গাজওয়া বা যুদ্ধ ২ প্রকার।

তাই- এখন কেউ যদি এই হাদিসে ইমাম অর্থ কেবলমাত্র এবং একমাত্র সেনাপ্রধাণ সাব্যস্ত করে এই অর্থ খাস করে দেয়—"যে ই আদেশ দেয় সে ই ইমাম।" এবং এই ফিকহ প্রয়োগ করে যে, আদেশ করার মত কেউ থাকলেই হলো অর্থাৎ সেনাপতি বানানোর মত কেউ থাকলেই হলো-; জিহাদ করা যাবে। তাহলে কি তা সহিহ বুঝ হবে?

কেননা যদি শার'ঈ ইমাম বিদ্যমান থাকে আর তিনি মাসলাহা'র জন্য ইকদামি/ আক্রমণাত্মক/ফরযে কিফায়া জিহাদ থেকে দূরে থাকেন তবে বিচ্ছিন্ন কারো জন্য আনুগত্য ভঙ্গ করে জিহাদে বের হওয়া হারাম। তা গুনাহের কাজ হবে, জিহাদ নয়। দেখুন-

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو

"ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা।

[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩]

এছাড়াও, বিভিন্ন সেনাদলের প্রধানকেও ইমাম বলা হয় এটা তো সকলেরই জানা বিষয়। যেমন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন জাহশ রাদিঃ কে বলা হয় প্রথম আমিরুল মু'মিনিন। কেন?

কারণ তিনি প্রথম প্রেরিত মুসলিম সেনাদলের আমির ছিলেন।

দেখুন- ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহঃ'র "সুওয়ারিম মিন হায়াতুস সাহাবা" (বাংলা অনুবাদেও উক্ত কথাটি পাবেন)।

তাই ইমামের অর্থ নিজের সুবিধামতো বসিয়ে সুবিধা মতো শর্তারোপ করা সহিহ হয়নি তা বোঝানো গেল আশা করি। তাড়াহুড়াপ্রবণ না হয়ে একাধিকবার পড়লে উত্তর পাওয়া যাবে। লেখা পড়েই উত্তর লিখতে বসলে আলোচনার পয়েন্টগুলো মাথার উপর দিয়ে যাবে এবং আলোচনা করাই হয় নি মনে করাটা স্বাভাবিক।

যদিও পূর্বের আলোচনাই যথেষ্ট ছিল তবুও বোঝার সুবিধার্থে আরও একটু আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা সহজ বিষয় সহজে বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পর্ব ৭ঃ

শায়খ রহঃ জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অস্তিত্বের শর্ত আরোপের পক্ষে দলীল টানতে গিয়ে লেখেন-

"মুআবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন।

তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন।

(১) এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। (৩)" (ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃষ্ঠা ৪৯)

১) প্রথমত,

ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান রাখা কোনো ব্যক্তিও যে এসব কথা বলতে পারে এটা আমার জানা ছিল না... রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া, রাষ্ট্র ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলামে আলাদা রুলিং আছে... কাউকে শুধু বাইয়াত দিয়ে কিছু ব্যাক্তি চিঠি লিখে দিলেই উক্ত ব্যাক্তি রাষ্ট্রপতি হয়ে যায়!!?

এমনকি হুসাইন রাদিঃ সেখানে ছিলেনও না... কই পেলেন এমন ব্যখ্যা তিনি... !!?
বরং মুরজিয়া মাদখালিদের বইয়ে তো এর উল্টো কথাই লেখা... আগ্রহী ব্যক্তিদের ইমাম মাওয়ারদি রহঃ লিখিত "আহকামুস সুলতানিয়া" পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি... ইংরেজিতেও পাবেন ইনশা'আল্লাহ।

#দ্বিতীয়ত, জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান শর্ত হলে, কুফাবাসীরা যখন বায়াত উঠিয়ে নেন (অর্থাৎ রাষ্ট্র (মরহুমের নব-আবিষ্কৃত পরিভাষায়) তখন আর নেই) তারপর কারবালায় হুসাইন রাদিঃ যুদ্ধ করেছিলেন। সেটা কীভাবে জায়েজ হয়!!!!! কেননা, ততক্ষণে কুফার ব্যক্তিরা সাইয়িদুনা হুসাইন রাদিঃ এর উপর থেকে বায়াত উঠিয়ে নিয়েছে... অর্থাৎ হুসাইন রাদিঃ কারবালায় রাষ্ট্রপ্রধান(!) হিসেবে জিহাদ করেন নি...

এছাড়াও, মরহুম শায়খের মতে কুফার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে হুসাইন রাদিঃ যুদ্ধ করেছেন। অথচ, হুসাইন রাদিঃ এর সাথে কুফাবাসীরা তো ছিলই না!!!! একথা শায়খ রাহিমাহুল্লাহ স্বয়ং নিজেও বলেছেন যে, হুসাইন বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে কুফাবাসীর সাক্ষাৎও হয়নি, কারবালার প্রান্তরে কুফাবাসীর কেউ সেখানে ছিলও না। তাহলে হুসাইন রাদিঃ কীভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হলো!?!

শায়খ একথাও বলেছেন যে, কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধ হওয়ার আগেই কুফাবাসী বায়াত উঠিয়ে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের আনুগত্য করে। দেখুন শায়খের পূর্ণ বয়ানঃ https://www.youtube.com/watch?v=fu৩D১--j৭iE

সুবহান'আল্লাহ! বিষয়টি জানা সত্ত্বেও, নিজে প্রচার করা সত্ত্বেও এই বইটিতে এমন আশ্চর্য তথ্য কীভাবে তিনি উল্লেখ করলেন !!!!?

জিহাদের পথে নিবৃত্ত করতঃ আরোপিত আশ্চর্য শর্তে বৈধতা দানে ইসলামের ইতিহাসই পাল্টে ফেলার মানে কি হতে পারে!!?

আল্লাহ তা'আলা শায়খকে ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করুন। আমিন।

বাস্তবিকই, এই বক্তব্যটি এতই অদ্ভুত যে... আমি হাসব না কাঁদব বুঝেই উঠতে পারছিলাম না অনেকক্ষণ থেকে...

২) দুটি রাষ্ট্র, অর্থাৎ কুফার আর ইয়াজিদের অধীন হিজাজ, সিরিয়াসহ বাকি মুসলিম ভূমির মাঝে যুদ্ধ হয়েছে !?!? কারবালার প্রান্তরে দুটি রাষ্ট্র যুদ্ধ করেছিল?! এগুলো মানে... আল্লাহ্* মাফ করুন... কী বলব !! ১ম পয়েন্টেই ক্লিয়ার হয়েছে।

অথচ শায়খ নিজেই উনার লেকচারে বলেছেন, কারবালার প্রান্তরে উবাইদুল্লাহ জিয়াদের বাহিনীর সামনে শুধু হুসাইন রাদিঃ'র পরিবার উপস্থিত ছিলেন। তো শায়খের ভাষ্য অনুযায়ী- এসকল নিরীহ নারী-শিশু কুফার সেনাবাহিনী? সুবহান'আল্লাহ!!
আরও একটি বিষয়- হুসাইন রাদিঃ'র যুদ্ধকে আমাদের ইমামদের সকলেই জিহাদ হিসেবেই গণ্য করেছেন...

এবং ইতিহাসের সেরা বীরত্বের ঘটনাসমূহের একটি হিসেবেই উল্লেখ করেছেন... নিছক যুদ্ধ-বিগ্রহ না... . এগুলো সাহাবাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত বেয়াদবিমূলক কথা মনে হয়েছে আমার কাছে...

উপরে উল্লেখিত ভিডিওতে শায়খ রাহিমাহুল্লাহ নিজেও একথা বলেছেন অথচ বইয়ে কী ভাষা তিনি ব্যাবহার করলেন!!? হায় আল্লাহ!

৩) কখনোই আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিঃ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যুদ্ধ করেন নি... তিনি উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারপর হিজাজ দখল করেন...

এরপর সেখানে আলাদা খিলাফাহ ঘোষণা করেন।

সুবহান'আল্লাহ আশ্চর্য হতে হয়!! যা ইচ্ছা বলা হয়েছে এমন একটা বই মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। আল্লাহু আকবার!

(আরও জানতে আকবর শাহ নজিরাবাদি লিখিত "তারিখে ইসলাম", জয়নুল আবেদিন মিরাঠী লিখিত "খিলাফতে বনু উমাইয়া" পড়ার অনুরোধ রইলো- উভয়টিই সহজলোভ্য বই।)

খুবই অদ্ভুত আর্গুমেন্ট এসব... ঠিক কী কারণে জেনেশুনে শায়খ রহঃ এসব কাজ করতে গেলেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। আমার জানা নাই, এসব বিষয়কে ইলমি খিয়ানত বলা না হলে আর কোন বিষয়কে বলা হবে!!?

এই দায়িত্ব পাঠকের উপরই অর্পিত হলো, কেন শায়খ রহঃ স্রেফ নিজের মনগড়া শর্তকে প্রমাণ করতে গিয়ে এহেন জবরদস্তি করলেন!! . আল্লাহ্* আমাদের মাফ করুন... আমিন।

পর্ব ৮০ঃ

শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রহঃ 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' বইয়ের পৃষ্ঠা ৪৮ এ একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং তার অনুবাদ করেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"

হাদিসটি উল্লেখপূর্বক তিনি বলেছেন,

"বিধর্মীকে হত্যা তো দূরের কথা, বিধর্মীর সাথে অভদ্র আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।"

———

শায়খ রহঃ এখানে হাদিসটিতে উল্লেখিত **مُعَاهِدً** এর অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন অথবা ইচ্ছাকৃত ভুল করেছেন (আল্লাহ তা'আলা উনাকে ক্ষমা করুন)।

হাদিসে উল্লেখিত مُعَاهِدً/মু'আহিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ কাফির।

ইংরেজি অনুবাদ দেখুনঃ

১) Allah's Messenger (sallallaahu 'alaihi wasallam)said, Whoever killed a person having a treaty_of_protection with Muslims, shall not smell the scent of Paradise, though its scent is perceived from a distance of forty years.

২)Allah's Messenger (sallallaahu 'alaihi wasallam)said, "Whoever killed a Mu'ahid (a person who is granted the pledge_of_protection by the Muslims) shall not smell the fragrance of Paradise though its fragrance can be smelt at a distance of forty years (of traveling)."

—-

দেখুন বাংলা অনুবাদ->

১) আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি **চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিম্মীকে** হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ অবশ্যই চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। (hadithbd.com)

২) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন **জিম্মীকে** কতল করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।' (ihadis.com)

—-

তো কই হাদিসের প্রকৃত অর্থ আর কই শায়খ রহঃ এর করা অর্বাচীন অর্থ। দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি আছে এমন যে কারো জন্য এপর্যন্ত আলোচনাই যথেষ্ট...

তথাপি কিছু ব্যক্তি হয়তো অপব্যাখ্যা করে "দলীলের নামে গোঁজামিল" হাজির করতে পারে তাই আরেকটু স্পস্ট করা হচ্ছে।

শায়খ মু'আহিদ শব্দের ২টি অর্থ করেছেন-

ক) মুসলিম দেশে অবস্থানকারী ঐ দেশেরই অমুসলিম নাগরিক।

খ) মুসলিম দেশে অবস্থানকারী ভিন্ন দেশের অমুসলিম নাগরিক।

কিন্তু,

=> মুসলিম দেশে অবস্থানকারী কাফির এই হাদিসের আওতায় পরবে না যদি না সে চুক্তিবদ্ধ হয়।

=> অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিক মুসলিম দেশে আসলো কিন্তু চুক্তি ছাড়া, সেও এই হাদিসের আওতাভুক্ত হবে না।

=> আবার, মুসলিমদের ভূমিতে অবস্থান করে না এমন কাফিরও এই হাদিসের আওতাভুক্ত হবে যদি সে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে।

তো কোনো দিক থেকেই এই ভ্রান্তির স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করার সুযোগ নেই।

শায়খ রহঃ'র এই অর্থের দূরবর্তী ব্যাখ্যা করেও এটা প্রমাণ করা সম্ভব না যে, উনি হাদিসের অর্থ পাল্টে দেন নি।

শুধু অর্থ নয়, এতে দ্বীনের একটি মূলনীতিই পুরোপুরি পাল্টে যায়।

শায়খের সংজ্ঞা গ্রহণ করলে, ফিলিস্তিন দখল করে থাকা ইহুদিরাও মু'আহিদ (মুসলিম দেশে তারা ৬০বছরেরও অধিক সময় ধরে বাস করা অমুসলিম নাগরিক) এবং ইরাকে দশ লক্ষাধিক নারীপুরুষ ও শিশু হত্যাকারি আমেরিকানরাও মু'আহিদ (মুসলিম দেশে অবস্থানকারী ভিন্ন দেশের অমুসলিম নাগরিক)।

মুসলিম দেশে অবস্থানকারী আগ্রাসী কাফিররা মু'আহিদ নয়। এব্যাপারে আরও জানতে পড়ুনঃ

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_২৩৫৬০.html

—-

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে,

এমন কাজ পূর্বে বেরলভিদের করতে দেখেছি যে, তারা দরুদের অনুবাদে মিলাদ/কিয়াম লিখে "মিলাদ/ কিয়াম করা" মুস্তাহাব সাব্যস্ত করে থাকে। কারণ

দরুদ আর কিয়াম নাকি একই। এব্যাপারে তাদের কাছে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রহঃ'র পক্ষ হতে তাদের কাছে দলীলও আছে ...

তারা যে রকম কিয়াম আর দরুদ একই মনে করে দরুদের অর্থ মিলাদ/কিয়াম করা সম্পূর্ণ বৈধ মনে করেন তেমনই কিছু সহিহ আকিদার ভাইদেরকে পেলাম যারা নিজেদের স্বপক্ষের দলীল জবরদস্তিমূলকভাবে প্রমাণ করতে কবরপূজারীদের অনুসরণে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সহিহ বুঝ দান করুন। আমিন।

(আপডেট হবে ইনশা'আল্লাহ)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৫২৫

হামাসের আসল রূপ

[khalid bin walid]

Senior Member

০৯-১০-২০১৭

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

দুপুর সময়, জুম্মা'বার, ইবনে তাইমিয়াহ মাসজিদ, মুসলিমদের হৃদয় ফিলিস্তিন এর গাযা উপত্যাকায়।

হামাস হামলা করে আল কায়দার মুজাহিদীনদের উপর, তাদের উপর চালায় গণহত্যা...
ভিডিওটা দেখে নিন, মাইকে তাকবির দেওয়ার পরেও শায়েখকে হত্যা করে হামাস কারণ শাইখ ও তার অনুসারীরা শুধুমাত্র শরীয়াহ দ্বারা শাসনের ইচ্ছা পোষণ করেছিল, যেটা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লার আদেশ ও প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।

https://m.youtube.com/watch?v=W৮HfX_WHL০k

ফিলিস্তিনের জাতিয়বাদী হামাস গাজাতে কোন "জঙ্গি" দলের সদস্যকে থাকতে দেয় না, তাদের হত্যা বা গ্রেপ্তার করে, আল কায়দা হোক বা খারিজী জাহান্নামের কুকুর আইএস হোক, সবার ভাগ্যে একই, জঙ্গিরা কি ইজরায়েলে তাহলে বিমান-ড্রোন দিয়ে হামলা করবে? তবুও তো আশেপাশের আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী মুর্তাদ শাসকেরাই আগে ইসরায়েলকে বাচাতে আসবে তাদের আর্মি, এয়ারফোর্স নিয়ে...
হামাস বছরের পর বছর গাজার ক্ষমতা থাকলেও গাজাতে শরিয়াত কায়েম করে নি। মুসলিমদের প্রথম কিবলা, মাসজিদুল আকসা মুক্ত করার চেষ্টা করেনি। শিয়া কাফেরদের সাথে তাদের মাখামাখি সম্পর্ক।

হামাস কিভাবে গাজাতে মসজিদে হামলা করে মসজিদ ধংশ করেছে ও মসজিদের মাইকে কালেমা পড়েও তাদের বাঁচার সুযোগ দেয় নি...

ভিডিও লিংক :

https://www.youtube.com/watch?v=jAIgxW৮G১cY

আরবের একটি পেজের লিংক :

https://web.facebook.com/photo.php?f...০৫৭৯১৫১&type=৩

হামাসের কিছু ভালো কাজ আছে সঙ্গে সঙ্গে শিয়া কাফেরদের সাথে মাখামাখি আছে। ভিডিওটা পূর্ণরূপে দেখে সিদ্ধান্ত নিবেন। অন্ধের মত সিদ্ধান্ত নিবেন না। এই মোডারেটেরা বিভিন্ন সময় এসে বলে জঙ্গিরা কেনো ইজরায়েলে হামলা করে না? আশা করি ভিডিওটা দেখলে তাদের মুখে কুলুপ দিতে ব্যাধ্য হবে। ইজরায়েলে হামলা না করা জঙ্গিদের দোষ, না মোডারেট হামাসের দোষ?

আল কায়েদার মানহায আনুসারী গ্রুপটার ব্যাপারে বিস্তারিতঃ

গ্রুপটির লিডার শাইখ আব্দুল লাত্বিফ মুসা-

শায়েখ আব্দুল লাতিফ মুসা ফিলিস্তিনের গাজাতে ১৯৫৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১১ বছর বয়সে মাধ্যমিক পড়া শেষ করেন।এরপর মেডিসিন বিষয় ডিগ্রীলাভ করেন। ১৯৭৯ সালে Faculty of Medicine of Alexandria University ডক্টর ও শিক্ষক হিসাবে জয়েন করেন । সেখানে তিনি Sheikh Said Abdul Azeem, Sheikh Mohamed Bin Ismail al-Muqaddim, Sheikh Ahmed Fareed, and Sheikh Hamd Ibrahim. কাছে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন।

তারপর তিনি গাজাতে খান ইউনুস শহরে Ahl Al Hadith Al Sharif Centre এ ৫ বছর হাদিস বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। খান ইউনুস শহরে Ahl Al Sunnah মসজিদে ১৫ বছর খতিব ছিলেন, এরপর Nour Ala Al Hadoud মাসজিদে ১৮ মাস খতিব ছিলেন, মাসজিদটি ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর হামলায় ২০০৬

সালে ধংশ হয়ে গেলে তিনি Sheikh al Islam Ibn Taymiyah মসজিদ ইমাম ও খতিব ছিলেন শহিদ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তিনি Medicine of the Rafah Martyrs Medical Centre এর পরিচালক থাকা অবস্থাতে তিনি পাশাপাশি মসজিদ গুলোর খেদমতে ছিলেন।

শায়েখ ফিলিস্তিনের বড় মুফতি ছিলেন, শায়েখ কিছু ফতওয়ার কিতাব লিখেন।

শায়েখের লিখিত কিতাবের তালিকা: He wrote a number of books including a book on the issue of faith entitled Al Yaqout Wa Al Morgan Fi Aqeeda Ahl Al Iman [The Ruby and Corral of the Faith of the Believers] and Al Tareeq Al Sawi Fi Iftiqah Asr Al Nabi [The Straight Way for Following the Way of the Prophet]. There are also a number of recording attributed to al-Maqdisi in which he explains the issue of faith. He cemented his position as a mufti of international standing with his final book As'illa Wa Agwiba Sharia Hawl Al Qadiyah Al Filistaniyah [Juristic Questions and Answers Regarding the Palestinian Cause]. This book was published by the Beit al-Maqdis Publishing House, and was praised by Sheikh Mohamed Safwat Nour Al Din.

শায়েখের অসংখ্য অনুসারী ও ভক্ত তৈরি হয় ফিলিস্তিনসহ গাজার রাফা এলাকাতে, কয়েক হাজার তরুন শায়েখের ইবনে তাইমিয়া মাসজিদে জুম্মা পড়তে জড়ো হতেন। শায়েখের সাথে আল কায়দার মুজাহিদীনদের সম্পর্ক ছিলো, শায়েখ আল কায়দার মানহাজ অনুসরণ করতেন। আল কায়দার শায়েখ আসেম মাকসিদির (হাফিজাহুল্লাহ) সাথে সম্পর্ক রাখতেন। রাফাতে কয়েক শতাধিক (প্রায় ৫০০) আল কায়দার অনুসারী মুজাহিদ তৈরি হলে জুন্দু আনসারুলল্লাহ নামে ২০০৮ সালের নভেম্বরে দল গঠন করা হয়।

আল কায়দার অনুসারী জুন্দু আনসারুল্লাহের মুজাহিদীনরা ইজরায়েলের উপর ৮ জুন ২০০৯ সালে হামলা করে, ইজরায়েলের সৈন্যরা হামলাটি প্রতিহত করে,

আর ইজরায়েলের সৈন্যদের গুলিতে ৫ জন জুন্দু আনসারুল্লাহ মুজাহিদীন শহিদ হন। http://www.terrorism-info.org.il/mal...l/ipc_e০৩৫.htm

হামাস ২২ জুলাই ২০০৯ সালে জুন্দু আনসারুল্লাহ তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। হামাস ২০০৭ সালে ফাতহার কাছে থেকে গাজাকে দখল করে, হামাস মানব রচিত আইন দিয়ে গাজাকে পরিচালনা করে, তারা ফিলিস্তিনে ইসলামী শরিয়াত কায়েম করেনি।

রাফা এলাকাতে জুন্দু আনসারুল্লাহ এর সামান্যা এলাকা ছিলো, শায়েখ আবদুল লফিত মুসা রহঃ সেই এলাকাতে ইমারত ইসলামী ফিলিস্তিন ঘোষণা দেন ইবনে তাইমিয়া মসজিদে। ফিলিস্তিনি ইসলামী শরিয়াত কায়েমের জন্য ইমারত ইসলামি ফিলিস্তিন ঘোষণা দেন শায়েখ আবদুল লতিফ মুসা ও আল কায়দার অনুসারী মুজাহিদীন।
হামাস শায়েখের ইমারতি ইসলামী ঘোষণা করার সংবাদে হামলা করতে চলে আসে রাফার ইবনে তাইমিয়া মসজিদে, ইবনে তাইমিয়া মসজিদের আশেপাশে অবরোধ করে হামাস। তারপর মসজিদ ভর্তি মানুষের উপর গুলিতে ছুড়তে থাকে। হামাসের মসজিদে হামলায় ২৪ জন নিহত ও ১৩০ জন আহত হয়। জুন্দু আনসারুল্লাহ সামরিক কমান্ডার Abu Abdullah al Suri কে নির্মমভাবে হত্যা করা হামাস। আল কায়দার অনুসারী মুজাহিদীনদের গুলি করে হত্যা করতে থাকে। নিহত ২৪ জন বলা হলেও নিহতের সংখ্যা বেশি হবে। আল্লাহু ‘আলাম

সূত্র :

Jund Ansar Allah – Wikipedia

جند أنصار الله, Jund Ansar Allah (Arabic: Soldiers of the Supporters’ of Allah) is an armed Islamist organization...en.m.wikipedia.org
তাঁদের উপর হামাসের মসজিদে হামলা করার ভিডিও

https://goo.gl/cLf২Yh
ডকুমেন্ট্রি ভিডিও https://goo.gl/h৯৮JTq

আল কায়দার অনুসারী জুন্দু আনসারুল্লাহ মুজাহিদীনদের ট্রেনিং ভিডিও।

১=> https://goo.gl/৫xaEKa

২=> https://goo.gl/A৪Nxj৪

হামাস পরবর্তিতে আল কায়দার অনুসারীদের হত্যা ও গ্রেপ্তার করেছে। ২০১৩ সালে শায়েখ আবদুল লতিফ মুসা রহঃ এর ছেলেকে হামাস গ্রেপ্তার করে।

Son of Jund Ansar Allah leader reportedly arrested | FDD's Long War Journal

The Ibn Taymiyyah Media Center (ITMC), a jihadist media unit tied to the Mujahideen Shura Council in the Environs of...www.longwarjournal.org

আল কায়দার একটি ইউনিট এই জুন্দু আনসারুল্লাহ, আরো কয়েকটি দল আল কায়দার অনুসারী ফিলিস্তিনে ছিলো তাদের গ্রেপ্তার ও ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করেছে এই মোডারেট হামাস।

হামাসের কারণে ফিলিস্তিন আল্লাহ বরকত আল কায়দার মুজাহিদীনদের সাহায্য পায় নি। আল কায়দা পৃথিবীর প্রায় ৪৫-৫০ লাখ বর্গকিলোমিটার ইসলামি শরিয়াত কায়েম করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্* । তারপরও আল কায়দার বহুত রহম ও ইহসান হামাসকে ধংশ করার মত তাদের উপর হামলা করে নি। ৭ বছর আগের আল কায়দার সদস্যরা ফিলিস্তিনে স্থায়ী হতে পারলে ইহুদী ইজরায়েল আজ রক্ত ভূমিতে পরিনত হতো। বাইতুল আকসা বিজয়ের সপ্ন সত্যিতে রুপ নিত।

আল কায়দা ফিলিস্তিনে একটু মাটি পেলে সিরিয়া ইরাকের মত পৃথিবীর হাজার হাজার আল কায়দার মুজাহিদীন ফিলিস্তিনে হিজরত করার সুযোগ পেত। ফিলিস্তিনে তাওহিদ আল জিহাদ

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tawh...d_(Gaza_Strip)

সিনার বাইতিল আল মাকদিস।

গাজাতে জায়শুল ইসলাম

এই সবগুলো ফিলিস্তিনের আল কায়দার অনুসারী ছিলো।

শুধু হামাসের কারণে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের আল কায়দা সাহায্য করতে পারেনি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৬৮৮

দারুল ইসলাম ও দারুল হরব: আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (মৃত্যু: ৮৫৫হি.) বনাম মুফতী তাকী উসমানী

Ahmad Al-hindi

Member

০৯-১৫-২০১৭

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস **আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী** রহ. (মৃত্যু: ৮৫৫হি.) – যিনি বুখারী শরীফের শরাহ 'উমদাতুল কারী' এর লিখক – হেদায়ার শরাহ **'বিনায়া'** তে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন,

المراد بدار الإسلام بلاد تجري فيها أحكام الإسلام، وبلاد الحرب بلاد يجري فيها أمر عظيمهم، وتكون تحت قهره.اهـ

"দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐসব রাষ্ট্র যেগুলো ইসলামী আইন অনুযায়ী চলে। আর দারুল হরব হচ্ছে ঐসব রাষ্ট্র যেগুলো কাফেরদের রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশানুযায়ী চলে এবং সেগুলো তার আয়ত্বাধীন।"

(আল-বিনায়া: ৭/২১৭, কিতাবুস সিয়ার, বাবুল মুসতা'মান।)

লক্ষণীয়:

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তিনি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে দেননি যে,

"فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين"

"'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।"

যেমনটা বলেছেন শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যু: ৪৯০হি.)। দেখুন: (শরহুস সিয়ারীল কাবীর: পরিচ্ছেদ-১২৭, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬)

এভাবেও দেননি যে,

"دار الاسلام ما يجري فيه حكم امام المسلمين وكانوا فيه آمنين".

"'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর শাসন চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"

যেমনটা বলেছেন কুহুসতানী রহ. (মৃত্যু: ৯৫০হি.)। দেখুন: (জামিউর *রুমুজ:খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৬)

বরং তিনি সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন,

بلاد تجري فيها أحكام الإسلام

(যেসব রাষ্ট্র ইসলামী আইন অনুযায়ী চলে)।

তিনি মুসলমানদের হাতে থাকা না থাকার উপর ভিত্তি করে হুকুম লাগাননি। তিনি হুকুম লাগিয়েছেন আইনের উপর ভিত্তি করে। অতএব, রাষ্ট্র ইসলামী হওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন ইসলামী হওয়া আবশ্যক।

অপরদিকে তিনি দারুল হরবের সংজ্ঞায় বলেছেন,

بلاد يجري فيها أمر عظيمهم

(যেসব রাষ্ট্র কাফেরদের রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশানুযায়ী চলে)।

অর্থাৎ যেগুলো আল্লাহর আইন দিয়ে চলে না বরং গাইরুল্লাহর আইন দিয়ে চলে। কাফেরদের রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, সেখানকার কর্তৃত্ব গাইরুল্লাহর কাছে। আল্লাহ তাআলার শরীয়তের সেখানে কর্তৃত্ব নেই।

অতএব, তাঁর সংজ্ঞা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য রাষ্ট্র ইসলামী আইন অনুযায়ী শাসিত হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে যেসব রাষ্ট্র ইসলাম অনুযায়ী চলে না বরং মানুষের আদেশ নিষেধ ও তাদের বানানো আইন অনুযায়ী চলে সেগুলো দারুল ইসলাম নয়।

এ থেকে বুঝে আসে যে, সারাখসীরহ. এবংকুহুসতানীরহ. এরবক্তব্যে যে, মুসলমানদের হাতে থাকা কিংবা ইমামুল মুসলিমীনের শাসন চলার কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা মূলত ইসলামী শাসন জারি থাকাই উদ্দেশ্য।অধিকন্তু বাহ্যিকভাবে উনাদের বক্তব্যথেকেও এটা বুঝা যায়না যে,

আইনইসলামীনাহলেওরাষ্ট্রদারুলইসলামহয়েযাবে।বরংএরবিপরীতটাইবুঝাযায়।তা কীউসমানীসাহেবেরদাবিরখণ্ডনেইতিপূর্বেআমিতাআলোচনাকরেছি।

একটি সংশয়:

তাকী উসমানী সাহেবের দাবির পক্ষে কেউ হয়তো বলতে পারেন, তিনি যেহেতু গণতান্ত্রিক শাসকদেরকে কাফের মনে করেনে না তাই তার মতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদের হাতে। ফলে সারাখসী রহ. এবং কুহুসতানী রহ. এর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তিনি সেগুলোকে দারুল ইসলাম বলেছেন।

কিন্তু এ বক্তব্যে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। কারণ,

প্রথমত:

এসব শাসক কাফের হওয়াটা শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর এ ব্যাপারে বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামের ফতোয়াও বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এর বিপরীতে কোন দলীল দেননি এবং উলামায়ে কেরামের ফতোয়াগুলোর কোন জওয়াবও দেননি, অথচ তা জরুরী ছিল। কেননা, বিষয়টি একদিকে যেমন বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয় অপর দিকে এর সাথে আরোও অনেক বিধি বিধান সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়ত:

যদি মেনেও নেই যে, তিনি শাসকদেরকে কাফের মনে না করার কারণে ফুকাহায়ে কেরামের কারো কারো বক্তব্য থেকে তার সংশয় হতে পারে যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম- তবুও উনার দাবি ও আলোচনার উপর যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। কারণ, দারুল দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে। অনেকের বক্তব্য অনেকটাই সুস্পষ্ট। যেমন, দারুল ইসলামের ব্যাপারে আইনী রহ. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট্য।

المراد بدار الإسلام بلاد تجري فيها أحكام الإسلام

"দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐসব রাষ্ট্র যেগুলো ইসলামী আইন অনুযায়ী চলে।"

আরো কয়েকটি সুস্পষ্ট বক্তব্য:

♣ কাজী আবু ইয়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হি.) বলেন,

وكل داركانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام الكفر: فهي دار إسلام، وكل داركانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام: فهي داركفر.اهـ

"প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর।" (আল-মু'তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬)

এ বক্তব্য একেবারেই সুস্পষ্ট যে, দারের হুকুম নির্ভর করে তাতে প্রচলিত বিধানের উপর। বিধান ইসলামী হলে দারুল ইসলাম, কুফরী হলে দারুল কুফর।

♣ ইমাম মারদাবী রহ. (মৃত্যু: ৮৮৫হি.)বলেন,

ودارالحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر

"দারুল হরব ঐ ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী।" [আল-ইনসাফঃ৪/১২১]

দারুল হরবের ব্যাপারে এ বক্তব্য স্পষ্ট।

♣ ইবনু মুফলীহ আল-হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৬৩হি.)- যিনি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর শাগরেদ - বলেন,

فكل دارغلب عليها أحكام المسلمين فدارالإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدارالكفر، ولا دارلغيرهما

"প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের আহকাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম। আর যদি তাতে কাফেরদের আহকাম বিজয়ী হয় তাহলে তা দারুল কুফর। এই দুই প্রকার রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যকোন রাষ্ট্র নেই।" [আল-আদাবুশ শরঈয়্যাহঃ ১/২১২]

সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের আহকাম বলতে ইসলামী আহকাম আর কাফেরদের আহকাম বলতে কুফরী আহকাম উদ্দেশ্য। কাজেই এ বক্তব্যও সুস্পষ্ট।

♣ 'আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ' তে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে-

دارالإسلام هي :كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.اهـ

“দারুল ইসলাম প্রত্যেক এমন ভূখন্ড যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে।”

دارالحرب هي :كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة.اهـ

“দারুল হরব প্রত্যেক এমন ভূখন্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে।” [‘আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ্ আল-কুয়েতিয়্যাহ’: ২০/২০১, হরফ: দাল]

এ বক্তব্যও স্পষ্ট।

উচিৎ ছিল তাদের সামগ্রীক বক্তব্যের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি তা না করে বরং কয়েকটা অস্পষ্ট বক্তব্যকে নিজের মতো করে ব্যখ্যা করে দাবি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি পর্যালোচনায় দেখিয়েছি যে, আইম্মায়ে কেরামের যেসব উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন সেগুলোর কোনটাই তার পক্ষের দলীল হয় না। বরং সেগুলো থেকে তার বিপরীত বুঝে আসে।

তৃতীয়ত:

ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট বলে গেছেন যে, রাষ্ট্র হয়তো দারুল ইসলাম হবে নয়তো দারুল হরব হবে। মাঝামাঝি কোন সূরত নেই। আর আইনী রহ. এর বক্তব্য সহ আরো অনেকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য আইন ইসলামী হওয়া আবশ্যক। আর অন্যান্য আইম্মার বক্তব্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, আইন ইসলামী না হলেও রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। দারুল ইসলাম যদি না হয় তাহলে তো দারুল হরবই হবে। কারণ, মাঝামাঝি কোন সূরত নেই। এ হিসেবে আইম্মায়ে কেরামের সামগ্রীক বক্তব্যের আলোকে এসব রাষ্ট্র দারুল হরব হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হয়। দারুল ইসলাম প্রমাণিত হয় না।

চতুর্থত:

ফিকহের কিতাবাদিতে বলা হয়, ‘দারুল ইসলাম’। ‘দারুল মুসলিমীন’ বলা হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়, মুসলমানদের দিকে নয়। এ থেকে বুঝে আসে, কোন রাষ্ট্র ‘দারুল ইসলাম’ হওয়ার জন্য তাতে মুসলমান থাকা জরুরী নয়, কিন্তু ইসলাম থাকা জরুরী। আবার ইসলাম পরাজিত হয়ে থাকলে হবে

না। বিজয়ী বেশে থাকা শর্ত। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁর ফতোয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অতএব, যেখানে ইসলাম বিজয়ী তা দারুল ইসলাম যদিও তাতে মুসলমান না থাকে। যেমন, দারুল ইসলামের ঐ অংশ যেখানে যিম্মি কাফেররা বসবাস করে। আর যেখানে ইসলাম বিজয়ী নয় তা দারুল ইসলাম নয় যদিও তাতে অনেক মুসলমান থাকে। যেমন, ঐ দারুল হরব যেখানে মুসলমানরা কাফেরদের অনুমতি নিয়ে বা তাদের গাফলতির সুযোগে বসবাস করে। এ হিসেবেও কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম প্রমাণিত হয় না।

এতএব, শাসকদেরকে কাফের না ধরলেও এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম প্রমাণিত হয় না। আইম্মায়ে কেরামের সামগ্রীক বক্তব্যের দিকে তাকালে বরং এর বিপরীতই বুঝে আসে। কাজেই তাকী উসমানী সাহেবের সংশয়কে মেনে নিলেও উনার দাবি ও আলোচনাকে যথার্থ বলার কোন সুযোগ নেই। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৭৩৪

মুফতী তাকী উসমানী এবং ইসলামী খেলাফত ও রাজনীতি-১

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১৩-২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد...

ইসলামী খেলাফত, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাকী উসমানী সাহেব 'ইসলাম আউর সিয়াসী নজরিয়্যাত' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি বাংলাদেশে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। কোন কোন দারুল ইফতায় এটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নেসাবভুক্ত করা হয়েছে। বাংলায় এর একাধিক তরজমাও হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে আলেম উলামাদের অনেকের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ময়দানে কিতাবটি দিশারী হিসেবে গৃহিত হয়েছে। কিতাবটি হাতে পেয়ে অনেকে যেন বর্তমান সময়ের অনেক জটিল সমস্যার সঠিক সমাধান পেয়ে গেছেন। ইসলামী রাজনীতির সঠিক নির্দেশনা পেয়ে গেছেন বলে মনে করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তানী একজন লেখকের এমন একটি কিতাবকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চলার পথের পাথেয় ও যথাযোগ্য রাহবার বলে মনে করছেন। কিতাব ও কিতাবের লিখককে হিন্দুস্তানের গৌরব বলে মনে করছেন।

কিন্তু যারা দ্বীনে ইসলামের মেজাজ সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন; ইসলামী খেলাফত, রাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে মোটামুটি অবগত আছেন এবং বর্তমান বিশ্ব-শাসনব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন রয়েছেন- তাদের কাছে আশাকরি অস্পষ্ট থাকবে না যে, কিতাবটিতে মূলত সঠিক ইসলামী খেলাফত ও

রাষ্ট্রনীতি পেশ করার নাম করে প্রচলিত ইসলাম বিরোধি শাসনব্যবস্থাকে ইসলামের নামে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ হিসেবে কিতাবটিকে হিন্দুস্তানের গৌরব গণ্য করার পরিবর্তে হিন্দুস্তান থেকে উদ্ভূত এক ফিতনা বলে গণ্য করা উচিৎ।

কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য:

সার কথায় যদি কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই তাহলে বলা যায়,

১. কিতাবের লিখক মনে হয় হীনমন্যতার শিকার, যার বহি:প্রকাশ তার এ কিতাবে ঘটেছে। বর্তমান কুফরী শাসন ব্যবস্থা এবং কাফের ও তাদের দালালদের জয় জয়কার দেখে তিনি হয়তো ভড়কে গিয়েছেন। ফলে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সঠিক মেজাজ তুলে ধরার পরিবর্তে ইসলামকে বরং যেন আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে তার পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

২. কাফেররা যে ইসলাম ও মুসলামনদের দুশমন, ইসলাম গ্রহণ কিংবা ইসলামী হুকুমতের অধীনস্থ হয়ে জিযিয়া দিয়ে জীবন যাপনের অধিকার লাভ ব্যতীত যে তাদের দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই- এই ধ্রুব সত্যটি তুলে ধরার পরিবর্তে তিনি কাফেরদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ, তাদের সাথে উত্তম আচরণ, তাদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদী নরম নরম বিধানাবলীর আলোচনা মন ভরে করেছেন। তাদের সাথে জিহাদের ঘোষণা না দিয়ে বরং সমঝোতার পথ বেঁচে নিয়েছেন। পরিণতিতে কিতাবটিতে ইসলামের সঠিক মেজাজ চরমভাবে প্রহসনের শিকার হয়েছে।

৩. জিহাদের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্তাকারে করেছেন অথচ কাফেরদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ, তাদের সাথে উত্তম আচরণ, তাদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদী আলোচনা বেশ দীর্ঘায়িত করেছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের জিহাদের বিধানকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরিবর্তে আলোচনাকে এদিক সেদিক ঘুরিয়েছেন। দিফায়ী জিহাদের কথা কিছুটা সুস্পষ্ট বললেও ইকদামী জিহাদের আলোচনা এমনভাবে করেছেন যে, তাতে ইকদামী জিহাদের মূল রূহটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

৪. প্রচলিত কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী শাসন, শাসকদেরকে খলিফাতুল মুসলিমীন প্রমাণ করার এবং কুফর শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম তথা

ইসলামী রাষ্ট্র প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। যথাসম্ভব শাসকদের কুফরী কর্মের বিরুদ্ধে বলার পরিবর্তে বরং তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তাদের আনুগত্যকে ফরয সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এর অনেক ক্ষেত্রে তিনি কুরআন, হাদীস ও আইম্মায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করার পরিবর্তে আলোচনাকে এদিক সেদিক ঘুরিয়েছেন। আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে নিজে থেকে মত দিয়ে এবং আইম্মায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিত্যাগ করে অস্পষ্ট কিছু বক্তব্য এনে সেগুলোকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে প্রচলিত কুফরী শাসন ও শাসকদের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

৫. অনেক ক্ষেত্রে তাহকীকের বেলায় বড়ই দুর্বলতার প্রমাণ দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তো এমন তাহকীক ও মতামত পেশ করেছেন যে, সাধারণ তালিবুল ইলমরাও বুঝতে পারবে, এখানে কারচুপি করা হচ্ছে কিংবা লিখক পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছেন কিংবা শাসকদের রোষানল থেকে নিজেকে রক্ষার নিমিত্তে সত্য কথাটা গোপন করেছেন কিংবা কিছু একটা এখানে হয়েছে।

৬. আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কুফর, এই ধরণের শাসক মুরতাদ, এদেরকে অপসারণ করা ফরয, এইসব রাষ্ট্র দারুল হরব, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাসরত কাফেররা জিম্মি নয়... ইত্যাদী যেসব মাসআলায় বর্তমান মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এবং কিছুকাল পূর্বের বিশ্ববরেণ্য উলামা মাশায়েখগণ সুস্পষ্ট মত দিয়ে গেছেন সেগুলোতে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তার নিজের মতামতকে এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যেন এটিই শরীয়তের শত-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

৭. অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে পরিহার করে এমনভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোচনা করেছেন যে, তাতে বাস্তবতাটা মাটিচাপা পড়ে গেছে।

কিতাব সম্পর্কে এই যা কিছু আমি বললাম এগুলো বানানো কিছু নয়। ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে অতিরঞ্জনও নয়। তিলকে তাল বানানোও নয়। কিতাব সকলের সামনেই আছে। পড়ে দেখলেই মন্তব্যের বাস্তবতা বুঝা যাবে।

পাঠকের পক্ষ থেকে আপত্তি:

১. কোন কোন পাঠক হয়তো এখানে আপত্তি উঠাতে পারেন যে, তাকী উসমানী সাহেব তার এ কিতাবে তো আর দুনিয়ার সব কিছু বর্ণনা করার দায়িত্ব নেননি। যতটুকু মুনাসিব মনে করেছেন বর্ণনা করেছেন। বাকিটা ছেড়ে দিয়েছেন। এটা দোষের কি হলো যে সমালোচনা লিখতে হবে??

২. কেউ কেউ হয়তো এও বলতে পারেন, বর্তমান শাসকরা যে কতটা ভয়ংকর তা সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় পরিষ্কার সত্য বলতে গেলে জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সব কিছুই হারানোর আশংখা রয়েছে। কাজেই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে যাতে শাসকদের বিরুদ্ধে না যায় তাতে দোষের কি আছে??

৩. এও বলা হতে পারে যে, তাকী উসমানী সাহেব কিতাবে নিজের ব্যক্তিগত মতামত পেশ করেছেন। এতে যদি ভুল হয় তো মানুষ হিসেবে ভুল হতেই পারে। এতে সমালোচনা লিখে জন সম্মুখে প্রকাশ করার কি আছে??

৪. তাকী উসমানী সাহেবের মত তো আরো অনেকেই এই ধরণের আকীদা পোষণ করেন। কথায় কাজে, লেখা-লেখিতে, বয়ান-বক্তৃতায় তা প্রকাশও করেন। তাদের সমালোচনা না করে তাকী উসমানী সাহেবের কিতাবের দিকে কেন নজর দিলেন?

আপত্তির জওয়াব:

প্রথম আপত্তির ক্ষেত্রে বলবো, কোন বিষয় আলোচনা না করা এক জিনিস আর ভুল আলোচনা করা বা অনিচ্ছাকৃক ভুলের শিকার হওয়া কিংবা আলোচনা করে তাকে বিকৃত করা এবং বাস্তবতাকে ধামাচাপা দেয়া আরেক জিনিস। প্রথমটা ক্ষেত্র বিশেষে সমালোচনাযোগ্য না হলেও দ্বিতীয়টার সমালোচনা আবশ্যক। কেননা, এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত লিখক যখন তাকী উসমানী সাহেবের মত গণ্যমান্য ও অনুসরণীয় কেউ হন।

দ্বিতীয় আপত্তির জওয়াব: শাসকের ভয়ে অনেক সময় চুপ থাকার বৈধতা আছে। কিন্তু নিজেকে রক্ষার জন্য এমন আলোচনা ছড়ানোর অনুমতি নেই যার কারণে জনগণ বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে। বিশেষত যখন তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বরং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশংখা থাকে। যেমনটা তাকী উসমানী সাহেবের এ কিতাবের বেলায় ঘটেছে যে তা গোটা হিন্দুস্তানে ছড়িয়েছে।

এমতাবস্থায় এর প্রকাশ্য ও ব্যাপক সমালোচনা ব্যতীত মানুষকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় আপত্তির জওয়াব: তাকী উসমানী সাহেব যা কিছু পেশ করেছেন দু'য়েক জায়গা ব্যতীত বাকি সকল কিছুকেই শরীয়তের সিদ্ধান্ত হিসেবেই পেশ করেছেন। একথা বলেননি যে, এগুলো আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এতে অন্যদের দ্বিমত রয়েছে। অধিকন্তু যদি সেগুলো ব্যক্তিগত অভিমতও হয়ে থাকে তবুও পাঠক বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ, তারা সেটাকে শরীয়তের সিদ্ধান্ত হিসেবেই গ্রহণ করবে, তাকী উসমানী সাহেবের নিজস্ব মতামত হিসেবে নয়। শুধু এতটুকুই নয়, বরং যারা এই মতের বিরুদ্ধে যাবে অনেক পাঠক তাদেরকে গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করবে। এমতাবস্থায় এর পর্যালোচনা জরুরী।

চতুর্থ আপত্তির জওয়াব: প্রথমত আমি ব্যক্তির সমালোচনা করছি না, বিষয়বস্তুর সমালোচনা করছি। এতে তাকী উসমানী সাহেবের খণ্ডন হয়ে গেলে বাকি সকলেরই খণ্ডন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত তাকী উসমানী সাহেবেরটা লোকজনে গ্রহণ করছেন বেশি। তার দ্বারা যতটা প্রভাবিত তারা হচ্ছেন অন্যদের দ্বারা ততটা হচ্ছেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকী উসমানী সাহেবের কিতাবের পর্যালোচনা আগে শুরু করাটাই যুক্তি যুক্ত।

মোটকথা, তাকী উসমানী সাহেব বাংলাদেশী উলামা-তুলাবার কাছে একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার কথাকে সহজে সকলে মেনে নিচ্ছে এবং নেবে। এমতাবস্থায় যদি কিতাবটির সমালোচনা ও পর্যালোচনা না লিখা হয় তাহলে ব্যাপক বিভ্রান্তির আশংখা আছে। এ দিকে লক্ষ্য করেই পর্যালোচনায় হাত দিয়েছি।

বি.দ্র.

১. কেউ কেউ বলে থাকেন, 'তাকী উসমানী সাহেব কাফেরদের দালাল।' আমি এতে একমত নই। কেননা, যথার্থ দলীল প্রমাণ ব্যতীত কারোও ব্যাপারে কিছু বলা যায় না। বরং আমি এতটুকু মনে করি যে, তাকী উসমানী সাহেব অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে ভুল করেছেন কিংবা পারিপার্শ্বিকতা ও যুগের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

২. আমি তাকী উসমানী সাহেবের দ্বীনদারির উপর হামলা করছি না। তার নিয়তের উপরও না। তিনি হয়তো যা লিখেছেন খালেছ দ্বীনি উপকারের জন্যই লিখেছেন।

কিন্তু দ্বীনদারী কিংবা ইখলাস ভুল-শুদ্ধের মাপকাটি নয়। একান্ত দ্বীনদার এবং মুখলিস ব্যক্তিও ভুলের শিকার হতে পারেন। পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। দলীল প্রমাণ ব্যতীত কারো ইখলাস ও দ্বীনদারির উপর হামলা না করে শরীয়তের নিক্তিতে তার কথার ওজন করাই মূল কাজ।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখার তাওফীক দেন। কোন প্রকার ইফরাত-তাফরীত ব্যতীত হকটা প্রকাশ করার তাওফীক দেন। আমীন! আমীন! আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৭১৭

মুফতী তাকী উসমানী এবং ইসলামী খেলাফত ও রাজনীতি-২

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-১৫-২০১৭

আরেকটি আপত্তি:

কেউ কেউ হয়তো আরো একটি আপত্তি করতে পারেন যে, সিয়াসত ও খেলাফত অত্যন্ত বড় একটি বিষয়। আপনি যার কিতাবের পর্যালোচনা লিখতে যাচ্ছেন তিনিও একজন বড় ব্যক্তিত্ব। কাজেই আপনার কাজটা অত্যন্ত বড় একটা কাজ। এ কাজের জন্য আপনি নিজেকে কিভাবে উপযুক্ত মনে করলেন? এ কাজের জন্য তো বড় বড় হাস্তি দরকার। তারা সেটার উপযুক্ত। আপনি ছোট মানুষ হয়ে এত বড় কাজের সাহস কিভাবি করলেন?

জওয়াব দেয়ার আগে এক বড় ব্যক্তির একটা কাহিনী শুনাই।

এক বড় ব্যক্তির কাছে আসিম উমার হাফিযাহুল্লাহ এর 'আদইয়ান কি জঙ্গ' কিতাবটি পৌঁছল। কিতাব দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, এত বড় বিষয়ে কলম ধরার জন্য আসেম উমারের মত সাধারণ ব্যক্তি কেন?? এর জন্য বড় বড় উলামায়ে কেরাম আছেন। তারা তাতে কলম ধরবেন। আসেম আবার উমার কলম ধরার কে??

আশ্চর্য্যের বিষয়! গোটা উপমহাদেশের মুজাহিদদের আমীর আসিম উমারকে তিনি যোগ্য মনে করলেন না অথচ তিনি নিজেই খেলাফত ও রাজনীতি বিষয়ে একটি কিতাব লিখেছেন, যেখানে তিনি মুফতি তাকী উসমানী সাহেবের চেয়েও আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। আল্লাহ মা'লূম তিনি নিজেকে কিভাবে এ বিষয়ে কলম ধরার যোগ্য মনে করলেন।

যাহোক, এবার আসুন জওয়াবে যাই... বড়রা থাকতেও আমি কেন কলম ধরলাম!!

জওয়াব সহজ। বড়রা যখন কলম ধরছেন না তখন ছোটদেরকেই ধরতে হবে।

প্রশ্ন: বড়রা কলম ধরছেন না কেন?

উত্তর: বড়রা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে আছেন,

ক. অনেক বড়'র অবস্থা হচ্ছে যেমন আমি একেবারে শুরুতে বলেছি,"বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে আলেম উলামাদের অনেকের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ময়দানে কিতাবটি দিশারী হিসেবে গৃহিত হয়েছে। কিতাবটি হাতে পেয়ে অনেকে যেন বর্তমান সময়ের অনেক জটিল সমস্যার সঠিক সমাধান পেয়ে গেছেন। ইসলামী রাজনীতির সঠিক নির্দেশনা পেয়ে গেছেন বলে মনে করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তানী একজন লেখকের এমন একটি কিতাবকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চলার পথের পাথেয় ও যথাযোগ্য রাহবার বলে মনে করছেন। কিতাব ও কিতাবের লিখককে হিন্দুস্তানের গৌরব বলে মনে করছেন।" তারা কিতাব এবং কিতাবের আদর্শ প্রচার প্রসারের যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

খ. অনেক বড়'র অবস্থা একটু আগে যে বড়'র কথা শোনালাম তার মত।

গ. অনেক বড়'র বড় কাজ আছে। তারা সেগুলোতেই ব্যস্ত। এসব বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার মত সময় তাদের হাতে নেই।

ঘ. অনেক বড় অনেক বড় বুযুর্গ। তারা রাজনীতির ময়দান থেকে যেমন দূরে থাকাকে সালামাত মনে করেন, তার আলোচনা থেকে দূরে থাকাকেও তেমনি সালামতের কারণ মনে করেন।

ঙ. অনেক বড় কিতাবের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে সংশয়ে আছেন। সঠিক সমাধান কি বুঝতে পারছেন না।

চ. অনেক বড় সমালোচনা লিখতে হিম্মত করতে পারছেন না। কারণ, এতে তাঁর মানসাব ছুটে যাওয়ার কিংবা সমালোচনা লিখতে গিয়ে নিজেই সমালোচিত হওয়ার কিংবা সরকারের রোষানলে পড়ার; জঙ্গী, উগ্রবাদি, তাকফীরি ইত্যাদী অনাকাঙ্খিত পদবীতে ভূষিত হওয়ার আশংখায় আছেন। তাই কলম ধরতে পারছেন না।

বড়রা উপরোল্লিখিত কারণসমূহ এবং এছাড়াও আরোও বিভিন্ন কারণে কলম ধরতে পারছেন না। কিন্তু কিতাবের আদর্শ তো আর থেমে থাকছে না। তা তো দিন দিন প্রচার হয়ে চলছে। এমতাবস্থায় ছোটদের উপরেই কলম ধরার দায়িত্ব বর্তায়। ***তবে আরেক প্রকার বড় আছেন যারা কলম ধরতে চান। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিংবা উম্মাহর বড় কোন খিদমাতে লিপ্ত থাকার কারণে কলম ধরতে***

পারছেন না। তবে আকাঙ্খা করছেন- যদি কেউ কলম ধরতো! তারা যদি শুনেন আমি কলম হাতে নিয়েছি তাহলে তারা আমার জন্য প্রাণভরে দোয়া করবেন। এই বড়দের দোয়া লাভের নিমিত্তে কলম ধরছি। মুসলিম ভাই-বোনদের সামান্য হলেও ফায়েদা হবে, কিছু না কিছু হলেও বিভ্রান্তির অপনোদন হবে আশা করে কলম ধরছি।

পর্যালোচনার বিষয়াবলী:

কিতাবে পর্যালোচনার অনেক কিছু রয়েছে। সবগুলো পর্যালোচনা করতে গেলে দীর্ঘ সময়, শ্রম ও সবর প্রয়োজন। মৌলিকভাবে যেসব বিষয়ে পর্যালোচনা করতে চাচ্ছি সেগুলো নিম্নরূপ:

১. শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নামায-রোযা ইত্যাদী বিধান পালন করতে পারাই কি দ্বীনে ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য না'কি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী শাসন কায়েম করারও উদ্দেশ্য?

২. খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা আছে কি? গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রী, এমপি ও রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি কি ইসলামী পদ্ধতি?

৩. সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের যে পদ্ধতি তাকী উসমানী সাহেব বাতলিয়েছেন তার পর্যালোচনা। পাঁচ বছর বা অন্য কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে খলিফা নির্ধারণের নজীর কি ইসলামের ইতিহাসে আছে? এতে কি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আপত্তি আছে? ৪. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচিত রাষ্ট্র প্রধান ও মন্ত্রী এমপিরা কোন পন্থায় নির্বাচিত: উম্মাহ স্বত: স্ফূর্ত নির্বাচন? না'কি জবর দখল?

৫. জবরদস্তী ক্ষমতাদখলকারীর আনুগত্য করা কি মুসলমানদের উপর আবশ্যক? হলে কখন? যে কেউ ক্ষমতা দখল করে নিলেই কি তার আনুগত্য করা ফরয হয়ে যাবে?

৬. মুসলিম বিশ্বে একই সময়ে একাধিক খলিফা হতে পারে কি? কুফরী আইন দিয়ে শাসনকারী শাসকবর্গ কি ইসলামের দৃষ্টিতে নিজ নিজ রাষ্ট্রে উক্ত রাষ্ট্রের মুসলমানদের ইমাম, খলিফা বা সুলতান হিসেবে গণ্য? তাদের আনুগত্য কি ফরয?

৭. শূরা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কতক বিষয়। মহিলা এবং কাফের কি মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারে?

৮. ইসলামী হুকুমতের উদ্দেশ্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট তাকী উসমানী সাহেবের বক্তব্য।

৯. কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ধরণ কিরূপ: বন্ধুত্বের? সহমর্মিতার? না'কি দুশমনির? কাফের রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি কেমন হবে?

১০. কাফেরদের সাথে সন্ধির বিধান কি? চুক্তি কখন বৈধ আর কখন অবৈধ?

১১. আহলে যিম্মা কারা? বর্তমান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসরত কাফেররা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে আহলে যিম্মা বলে গণ্য?

১২. দারের প্রকারভেদ। দারুল ইসলাম ও দারুল হরব কাকে বলে? কুফরী আইন দিয়ে শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম না দারুল হরব?

১৩. ইসলামে কি শুধু দিফায়ী-আত্মরক্ষামূলক জিহাদই ফরয না'কি ইকদামী-আক্রমণাত্মক জিহদাও ফরয? ইকদামী জিহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

১৪. শাসক কত প্রকার? তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান কি? বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের কি হুকুম?

এছাড়াও প্রসঙ্গত আরোও বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৭৩৮

পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কিভাবে কায়েম হবে? [তাকী উসমানী সাহেবের বয়ান।]

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০৯-২৩-২০১৭

পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হবে কিভাবে – এ প্রসঙ্গে তাকী উসমানী সাহেব বলেন,

বক্তব্যের ভিডিও লিংক:

https://www.youpak.com/watch?v=SqkR৩bF৩KA০

“পাকিস্তানের বাইরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইসলামী রাষ্ট্র রয়েছে। কিন্তু এই সৌভাগ্য পাকিস্তান এবং একমাত্র পাকিস্তানেরই রয়েছে যে,

(১). তার এবং তার বুনিয়াদি যে সংবিধান রয়েছে তাতে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু’র হাকিমিয়্যাহকে ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি আপনি অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে পাবেন না। এমনকি সৌদি আরবেও যেহেতু ঐরকম কোন সংবিধান নেই তাই তাতেও এত সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান নেই যে, হাকিমিয়্যাতে আ’লা আল্লাহ তাআলার জন্য সোপর্দ এবং এই রাষ্ট্রে যে হুকুমত কায়েম হবে তাতে হাকিমিয়্যাহ আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার জন্য সাব্যস্ত থাকবে এবং তারই প্রদত্ত আইনের উপর তা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সৌভাগ্য আর কোন রাষ্ট্রের নেই। এতই (নিয়ামত) আল্লাহ তাআলা তাবারাকা ওয়া তাআলা এই পাকিস্তানকে দান করেছেন।

(২). তদ্রূপ এই সৌভাগ্যও আর কোনও রাষ্ট্রের নেই যে, পাকিস্তানের সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে, পাকিস্তানে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরিত কোনও আইন বানানো যাবে না এবং বর্তমানে বিদ্যমান আইনকে পরিবর্তন করে কুরআন সুন্নাহর ধাঁচে রূপ দেয়া হবে। অন্য কোনও রাষ্ট্রে এত সুস্পষ্টভাবে এই দফা বিদ্যমান নেই।

(৩). শুধু এতটুকুই নয়, এই সংবিধানে এও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে যে, প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার আছে, যদি কেউ কুরআন সুন্নাহ বিরোধি কোন আইন দেখতে পায় তাহলে এই আইনকে রহিত করে তদস্থলে ইসলামী আইন প্রবর্তন করার দাবি আদালতে পেশ করতে পারবে। আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে তাহলে আদালতের এই অধিকার রয়েছে যে, এই আইনকে রহিত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার আদেশ জারি করতে পারবে। আফসোস! এই মহান দফা তো পাকিস্তানের সংবিধানে বিদ্যমান আছে কিন্তু হুকুমত, হুকুমতের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমি বলবো যে, আফসোস! দ্বীনদার সমাজের অনুভূতিহীনতার কারণে এই দফা বেকার পড়ে রয়েছে। এর থেকে তেমন কোন ফায়েদা লাভ করা যাচ্ছে না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই দফা বিদ্যমান আছে। আজও যদি আমরা দাবি করি, আমরা এই দফাকে বাস্তবায়িত করবো তো আলহামদুলিল্লাহ এর রাস্তা খোলা রয়েছে। কাজেই যেসব লোক এই প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই তাদের এই প্রোপাগান্ডা সম্পূর্ণ গলদ এবং ধোঁকাবাজি। শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আলহামদুলিল্লাহ রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই অনুভূতিহীনতা খতম করে অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। অনুভূতি সৃষ্টি করে এই দফাকে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। আমি সতের বছর শরয়ী আদালতে কাজ করেছি। এই সময়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুইশতেরও বেশি আইন আদালতের মাধ্যমে ইসলামী ধাঁচে বানানোর হুকুম জারি করেছি এবং হুকুমত ঐসব আইন বদলিয়েছে। কিন্তু আফসোস! এই দফা থেকে ফায়েদা লাভের নিমিত্তে আমাদের দ্বীনদার সমাজের পক্ষ থেকে কোনও দরখাস্ত দায়ের করা হয়নি। আমি হাত জোড় করে বলেছি, মিনতি করে বলেছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই দফা থেকে ফায়েদা লাভের নিমিত্তে আপনারা দরখাস্ত পেশ করুন। কিন্তু আফসোস! আমাদের পক্ষ থেকে কোনও দরখাস্ত দায়ের করা হয়নি। বেদ্বীনদের তরফ থেকে দরখাস্ত এসেছে, মুলহিদদের তরফ থেকে এসেছে এবং এর উপর যাচাই বাছাই হয়েছে। আমরা তখন দুইশতেরও বেশি আইন বদলিয়ে ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়াতে শুধু পাকিস্তানেরই এই সৌভাগ্য যে, তাতে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রয়েছে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে কোন আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তা পরিবর্তন করাতে পারে।"

এ হলো তাকী উসমানী সাহেবের বক্তব্য। উল্লেখ্য যে, ১-২-৩ নাম্বার তিনটি বুঝার সুবিধার্থে আমার নিজের থেকে লাগানো।

তাকী উসমানী সাহেবের এ বক্তব্যের উপর আমাদের কিছু পর্যালোচনা:

১. তাকী উসমানী সাহেবের বক্তব্যে একটি বাস্তব সত্য উঠে এসেছে যে, একমাত্র পাকিস্তান ব্যতীত মুসলিম নামধারী পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের সংবিধান হাকিমিয়্যাহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এমনকি সৌদি আরবও সুস্পষ্টরূপে হাকিমিয়্যা'র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তদ্রূপ পৃথিবীর কোন মুসলিম নামধারী রাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টভাবে এ কথা নেই যে, সে দেশের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনকি সৌদি আরবেও না। অর্থাৎ পাকিস্তান ব্যতীত বাকি সকল মুসলিম রাষ্ট্র কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আফসোস এমন ধ্রুব সত্যটি স্বীকার করে নেয়ার পরও মুফতী সাহেব মুসলিম নামধারী পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করেছেন এবং ফুকাহায়ে কেরামের কতক বক্তব্যের তাহরীফ-অপব্যাখ্যা করে দলীল পেশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ঐসব কুফরী রাষ্ট্রের শাসকদেরকে ইমামুল মুসলিমীন দাবি করে তাদের আনুগত্যকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন। হায়! কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও দারুল কুফর হল না, হয়ে গেল দারুল ইসলাম। মুসলামনদের দ্বীনের দুশমনরা হয়ে গেল তাদের ধর্মীয় ইমাম। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!!

২. তিনি দাবি করেছেন, পাকিস্তান হাকিমিয়্যা'র উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার এ দাবি কতটুকু সত্য তা পাকিস্তানের সংবিধান দেখলেই বুঝা যাবে। হাকিমুল উম্মাহ শায়খ আইমান আযযাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ অনেকের কাছ থেকে শুনছিলেন যে, পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামী। সেখানকার হুকুমত হাকিমিয়্যাহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, পশ্চিমা আদলে গড়ে উঠা আমেরিকার দালাল, চরম ইসলাম বিদ্বেষী যে পাকিস্তান তা হাকিমিয়্যাহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে? কিভাবে তা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়? পরে তিনি পাকিস্তানের সংবিধান মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করে দেখেন, তা মূলত হাকিমিয়্যা'র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত পাকিস্তানের হাকিমিয়্যাহ'র মালিকও জনগণ বা অন্য কথায় সংসদ সদস্যরা। পাকিস্তানের সংবিধানেই তা স্পষ্ট বলা আছে। পাকিস্তানের সংবিধান যে কুফরের উপর

প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণকল্পে তিনি 'আস-সুবহু ওয়াল কিনদীল' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি ১২৬ পৃষ্ঠার। আরবী বুঝেন এমন সকল ভাইকে আমি উপদেশ দেব কিতাবটি পড়ে নেয়ার জন্য। তাহলে পাকিস্তান সংবিধানে ইসলামের বাস্তবতা বুঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।

৩. তাকী উসমানী সাহেব বার বার বড় গলায় বুলি আউড়ান যে, পাকিস্তান ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কথা হল, শুধু নাম দিয়ে কাম কি? যে পাকিস্তান ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়েছিল জন্মের পরমূহুর্ত থেকে আজ পর্যন্ত কি তাতে ইসলাম কায়েম হয়েছে? পাকিস্তান তো বানানো হয়েছিল ইসলামের নামে। বানানো তো হয়েছিল এই কথার উপর যে, তা চলবে কুরআন অনুযায়ী। কিন্তু কই! জন্মের পর পাকিস্তানে কি ইসলামী সংবিধান জারি করা হল নাকি কুফরী সংবিধান? আল্লাহর শরীয়তের সংবিধান নাকি ব্রিটিশদের কুফরী সংবিধান? উলামায়ে কেরামের সংবিধান না'কি ব্রিটিশ দালালদের সংবিধান? তাকী উসমানী সাহেবও এই ধ্রুব সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন। দেখুন তার বক্তব্য, *"পাকিস্তানের সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে, পাকিস্তানে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরিত কোনও আইন বানানো যাবে না এবং বর্তমানে বিদ্যমান আইনকে পরিবর্তন করে কুরআন সুন্নাহর ধাঁচে রূপ দেয়া হবে।"*

অর্থাৎ বর্তমানে পাকিস্তান ব্রিটিশদের কুফরী সংবিধান দিয়েই চলবে। তবে ভবিষ্যতে কোন আইন ইসলাম পরিপন্থি বানানো যাবে না। আর বর্তমানে বিদ্যমান কুফরী আইনগুলো আস্তে আস্তে শরয়ী আদালতের মাধ্যমে ইসলামী আইনে রূপান্তর করা হবে।

এখানে তিনিটি প্রশ্ন,

ক. জন্মের পর পাকিস্তানের ভিত্তি কি ইসলামের উপর হল না'কি কুফরের উপর হল? অস্বীকার করার জু নেই যে, কুফরের উপর হল। কুফরী সংবিধানই জারি হল। ইসলামী সংবিধান হল না। ইসলামী শাসনও কায়েম হল না। তবে শাসকরা ওয়াদা করল, ভবিষ্যতে পাকিস্তান ইসলামী করা হবে।

মোটকথা, পাকিস্তানের ভিত্তি কুফরের উপর। আর ইসলামী হবে কি'না সেটা ভবিষ্যতের বিষয় ছিল। জন্মের মূহুর্তে পাকিস্তান ইসলামী ছিল না। পরবর্তীতে ইসলামী হয়েছে কি'না সেটা পরের দুই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর শীল।

খ. পরবর্তীতে কি পাকিস্তানে কুরআন সুন্নাহ বিরোধি আইন করা হয়নি? উত্তর হবে নি:সন্দেহে হয়েছে। ব্রিটিশ সংবিধানে মুসলিম পারিবারিক আইনের অনেক ধারা ইসলামী শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এ আইন দিয়েই ইংরেজরা হিন্দুস্তান শাসন করত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে এই আইনগুলো আগের মতোই পাকিস্তানের সংবিধানে ছিল। কিন্তু পরে এ কয়টা আইনও পরিবর্তন করে তদস্থলে কুফরী আইন চাল করা হয় যা এখনো চালু আছে। এ ছাড়াও হয়তো আরো অনেক কুফরী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ. শেষের প্রশ্নটি হল, শাসকরা যে ওয়াদা করেছিল প্রচলিত কুফরী আইনগুলোকে পরিবর্তন করে তদস্থলে ইসলামী আইন চালু করা হবে- আদৌ সেটা কি হয়েছে? সবাই জানে যে, তা আর হয়নি।

যখন শাসন শুরু হল কুফরী আইন দিয়ে, পরবর্তীতে আরোও নতুন নতুন কুফরী আইন প্রণয়ন করা হল আর আগের কুফরী আইনগুলো পরিবর্তন না করে আপন অবস্থায় বহাল রাখা হল – তখন কি পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হল না'কি আগের তুলনায় আরোও শক্ত কাফের রাষ্ট্র হল?? এরপরও পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করা হয় কিভাবে??

৪. সংবিধানে যে বলা ছিল,

"প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার আছে যে, যদি কেউ কুরআন সুন্নাহ বিরোধি কোন আইন দেখতে পায় তাহলে এই আইনকে রহিত করে তদস্থলে ইসলামী আইন প্রবর্তন করার দাবি আদালতে পেশ করতে পারবে। আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে তাহলে আদালতের এই অধিকার রয়েছে যে, এই আইনকে রহিত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার আদেশ জারি করতে পারবে।"

এখানে প্রশ্ন হল,

ক. *"আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে তাহলে আদালতের এই অধিকার রয়েছে যে, এই আইনকে রহিত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার আদেশ জারি করতে পারবে।"*

এখানে তো একথা নেই যে, আদালত অবশ্যই দাবি কবুল করবে। বরং যদি কবুল করে তবে করতে পারে। তাহলে আইন পরিবর্তনটা আদালতের দয়ার উপর রয়ে

গেল।

দ্বিতীয়ত আদালত কুফরী আইন রহিত করে ইসলামী আইন চালু করবে- তা তো বলা হয়নি। বরং চালু করার আদেশ জারি করবে। কিন্তু আদেশ পার্লামেন্ট সদস্যরা যে অবশ্যই মানবে এবং অবশ্যই ইসলামী আইন চালু করবে তা তো বলা হয়নি। যদি তারা ইসলামী আইন জারি করতে রাজি না হয় তাহলে অস্ত্র ও শক্তি প্রয়োগে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা হবে তা তো বলা হয়নি। তাহলে সংবিধানের এই দফা – যাকে তাকী সাহেব 'মহান দফা' বলে গর্ববোধ করছেন, আশার বাঁধ যার উপর বাঁধছেন – তার মাধ্যমে কুফরী আইন রহিত করে ইসলামী আইন চালু করা তো নিশ্চিত হল না।

খ. ইসলামের নামে যদি পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তো শুরুতেই কুফরী সংবিধান কেন চালু করা হল? দ্বিতীয়ত জনগণ কি এই কুফরী সংবিধানকেই ইসলামী পাকিস্তানের (!!) ইসলামী সংবিধানরূপে মেনে নিয়েছিল? না'কি তারা এর বিরোধিতা করেছিল? সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের আলেম উলামা, মুসলিম জনতা এই কুফরী সংবিধান মেনে নেয়নি। তারা একে প্রত্যাখান করেছিল। ইসলামী শরীয়তের জন্য মাঠে নেমেছিল। মিটিং মিছিল, দাবি দাওয়া সবই করেছিল। রক্তও ঝরিয়েছিল। উলামায়ে কেরাম ইসলামী সংবিধানের রূপরেখা তৈয়ার করে শাসকদের কাছ পেশও করেছিলেন। এক নয় দুই নয়, বছরের পর বছর তারা এর জন্য আন্দোলন করেছে। এখনও পর্যন্ত আন্দোলন চলছে। বাধ্য হয়ে তালেবানে ইসলামরা প্রসাশনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে। যুদ্ধও চলছে। কিন্তু কই! ইসলাম কি কায়েম হয়েছে? এরপরও পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র? কুফরের উপর ভিত্তি হয়েও ইসলামী রাষ্ট্র? কুফরের উপর অটল থেকেও ইসলামী রাষ্ট্র? ইসলাম পরিত্যাগ করেও ইসলামী রাষ্ট্র? ইসলাম প্রত্যাশীদের ইসলাম প্রত্যাশার কারণে হত্যার পরও ইসলামী রাষ্ট্র? ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থেকেও ইসলামী রাষ্ট্র? হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বুঝ দাও! আমীন! আমীন!

৫. ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ সত্তর বছরের মাথায়ও পাকিস্তান থেকে কুফরী সংবিধান সরানো গেল না। ইসলামী শাসন কায়েম করা গেল না। কেন গেল না? তাকী সাহেব বড়ই অদ্ভূত কারণ বাতলিয়েছেন। দেখুন উনার বক্তব্য,

"আফসোস! এই মহান দফা তো পাকিস্তানের সংবিধানে বিদ্যমান আছে কিন্তু হুকুমত, হুকুমতের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমি বলবো যে, আফসোস! দ্বীনদার সমাজের অনুভূতিহীনতার কারণে এই দফা বেকার পড়ে রয়েছে । এর থেকে তেমন কোন ফায়েদা লাভ করা যাচ্ছে না।"

আহা! যুগ যুগের বাস্তবতাকে তাকী সাহেব এক বক্তৃতার মঞ্চেই অস্বীকার করে ফেললেন। পাকিস্তানের মুসলামনদের কি কোন অনুভূতি ছিল না? এই সত্তর বছরেও তাদের কোন অনুভূতি জাগেনি না? কিভাবে তাকী সাহেব অস্বীকার করলেন এতবড় বাস্তবতাকে! উলামায়ে কেরাম কি ইসলামের দাবি জানাননি? কুফরকে কি প্রত্যাখান করেননি। সাধারণ মুসলমান কি শত হাজারো আন্দোলন করেনি? ইসলামের দাবিতে শত হাজারো মুসলমানের লাশ কি পড়েনি? আজও কি দাবি হচ্ছে না? আজও রক্ত ঝরছে না? এত কিছুর পরও কি করে বলতে পারলেন, 'আবেদনের অভাবে, অনুভূতির অভাবে ইসলাম কায়েম হচ্ছে না?'

অনুভূতিহীনতা আর গাফলতের অভিযোগ শাসকদের ব্যাপারেও করেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও করেছেন। তাদের গাফলতের কারণে ইসলাম কায়েম হচ্ছে না। এটা যে কত বড় বাস্তবতার অস্বীকার কোন চক্ষুষ্মানের কাছে তা অস্পষ্ট নয়। গাফলত দু'চার দিন হতে পারে। কেউ স্মরণ করানোর অভাবে হতে পারে। সত্তর বছর ধরেই কি গাফলত চলছে? যে রাষ্ট্র ইসলামের নামেই জন্মেছিল তা থেকে ইসলাম প্রত্যাহার করে কুফর চালু করা কি গাফলত? যুগ যুগ ধরে হাজারো আন্দোলনের পরও, হাজারো হাজার লাশ পড়ার পরও ইসলাম কায়েম না করা কি গাফলত? ইসলাম প্রত্যাশীদেরকে হত্যা করা কি গাফলত? ক্রুসেডারদের সাথে জোট বেঁধে ইসলামী ইমারতকে ধ্বংস করাও কি গাফলত? এটা কোন ধরণের গাফলত? কোন ধরণের গাফলতের কথা বলছেন তাকী সাহেব? এটা গাফলত না ইসলাম বিদ্বেষ? আপনি কি শিখাতে চাচ্ছেন আমাদেরকে? কি বুঝাতে চাচ্ছেন আমাদেরকে? মুসলিম উম্মাহকে আপনি একেবারেই অন্ধ মনে করেন? একেবারেই জ্ঞানহীন মূর্খ মনে করেন? আপনি কি মনে করেন আপনার চালবাজি তারা বুঝে না? আপনি কি মনে করেন আপনার ধোঁকাবাজি তারা বুঝে না? হ্যাঁ, যারা তাদের দ্বীন তাকী সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তারা একে গাফলত মনে করতে পারে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা আপনার চালবাজি বুঝে নিয়েছি। আপনার প্রতারণার ফাঁদে আমরা ইনশাআল্লাহ পড়বো না। হে আল্লাহ!

দাজ্জালদের দাজ্জালী থেকে তুমি তোমার বান্দাদেরকে বাঁচাও! হে আল্লাহ তুমি বাঁচাও! হে আল্লাহ তুমি বাঁচাও!

৬. তাকী সাহেব বলেন,

"যেসব লোক এই প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই তাদের এই প্রোপাগান্ডা সম্পূর্ণ গলদ এবং ধোঁকাবাজি। শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আলহামদুলিল্লাহ রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই অনুভূতিহীনতা খতম করে অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। অনুভূতি সৃষ্টি করে এই দফাকে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।"

আমরা দেখেছি যে, সত্তর বছরের মাথায়ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় কোন কাজ হয়নি? এমনকি হাজারো হাজারো লাশ পড়েও কোন লাভ হয়নি। পাকিস্তানী তাগুতরা যারা একসময় হিন্দুস্তানী জনসাধারণের সাথে গাদ্দারী করে ইংরেজদের গোলামী করেছে, যারা ক্রুসেডারদে পক্ষ হয়ে উসমানী খেলাফতকে ধ্বসং করেছে সেই গাদ্দাররা, সেই তাগুতরাই সত্তর বছর ধরে পাকিস্তানে কুফর টিকিয়ে রাখছে। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কোন শরীয়তে এখনোও এদের বিরুদ্ধে কিতাল করাকে ফরয ঘোষণা দেয় না? কোন সেই শরীয়ত? শরীয়তে মুহাম্মাদী – আলা সাহিবিহা সালাওয়াতু রাব্বি ওয়া সালামুহু – তে তো ইসলামী পন্হায় নির্বাচিত ইসলামী শাসক নামায কায়েম না করলেই, কিংবা নিজে নামায ছেড়ে দিলেই কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেই কিংবা দ্বীনের অন্যকোন অকাট্য বিধান বর্জন করায় অটল থাকলেই তার বিরুদ্ধে কিতালকে ফরয করা হয়েছে। তাহলে এইসব তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলাকে কোন শরীয়তের আলোকে তাকী সাহেব প্রোপাগান্ডা সাবস্ত করছেন? নিশ্চয় এটা শরীয়তে মুহাম্মাদী নয়। এটা আব্রাহাম লিংকনের শরীয়ত। এটা পারভেজ মোশাররফের শরীয়ত। এটা জারদারির শরীয়ত। এটা ভুট্টোর শরীয়ত। হতে পারে এটা তাকী সাহেবের শরীয়ত। কিন্তু এটা শরীয়তে মুহাম্মাদী নয়। এটা মুসলিম উম্মাহর শরীয়ত নয়। মুসলিম উম্মাহ তাকী সাহেবের শরীয়ত থেকে মুক্ত। এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭৮২৬

বিশ্বের সবচাইতে ধনী ও রহস্যে ঘেরা পরিবার ‘রথসচাইল্ড’

ibn jiad

Member

১০-২০-২০১৭

বিশ্বের সবচাইতে ধনী ও রহস্যে ঘেরা পরিবার ‘রথসচাইল্ড’

প্রতি বছর বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকা হয়, সেই তালিকার প্রথম দিকের সবাইকেই আমরা কমবেশি চিনি। কিন্তু একটা বিষয় জেনে খুবই অবাক লাগতো, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও ধনী পরিবার হিসেবে পরিচিত রথচাইল্ড পরিবারের কারো নাম সেখানে কখনোই দেখা যায় না! আসলে তাদের সম্পদের সঠিক হিসাব একমাত্র পরিবারের লোকেরা ছাড়া বাইরের কারো কাছে প্রকাশ পায় না। তবে বাইরের অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নানানভাবে তাদের সম্পদের পরিমাণ আন্দাজ করে থাকেন।

বর্তমান পৃথিবী অনেক উন্নত হচ্ছে, অথচ ধনী গরীবের ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলছে। এই ইস্যুর আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে সম্প্রতি “অক্সফাম”-এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক (নিম্নতর আয়ের) সমপরিমাণ লোকের সম্পদের পরিমাণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী ৮ জন লোকের সম্পদের পরিমাণের সমান! ব্যাপারটা ধরতে পারছেন? ৮ জন লোকের যে পরিমাণ সম্পদ, ৩৬০ কোটি লোকেরও সেই পরিমাণ সম্পদ!

পৃথিবী খুব নিষ্ঠুর জায়গা। উল্লেখ্য যে ফোর্বস সাময়িকীর হিসাব অনুযায়ী শীর্ষ ৮ জন ধনীর মোট সম্পদের পরিমাণ ৪২৬.২ বিলিয়ন ডলার (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)।

এই টাকা আসলে কত টাকা, তা হয়তো অনেকের মাথায়ই ধরবে না। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নয়নে নিদারুনভাবে ব্যর্থ, এইটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অক্সফামের এই রিপোর্টে নানা সমস্যার কথা উঠে আসলেও আসেনি এই বৈষম্যের পেছনে যেটা সবচেয়ে বড় কারণ তার কথা –“গ্লোবাল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং সিস্টেম”। আর হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গ আসলেই এসে পড়ে রথচাইল্ড পরিবারের কথা। পৃথিবীর

বর্তমান বর্তমান ব্যাঙ্কিং সিস্টেম কয়েকশ বছর ধরে অনেকটাই রথসচাইল্ড ফ্যামিলির পরিকল্পনায় গড়া। এর শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে, মেয়ার আমশেল রথসচাইল্ডের হাত ধরে।

আমশেল রথসচাইল্ড তার পাঁচ পুত্রকে পাঁচটি দেশে পাঠিয়ে তাদের ব্যাঙ্ককে প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপের ঐ সময়কার সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর গুলাতে নেপলস (ইটালি), প্যারিস (ফ্রান্স) , ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) ও লন্ডন (ইংল্যান্ড)-এ একটি করে ছেলে পাঠিয়ে দেন। তারা সেখানে গিয়ে রাজপরিবারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতো, তাদের যুদ্ধ চালানোর জন্য বিপুল পরিমাণে লোন দিতো। ফরাসী বিপ্লবের সময় রথসচাইল্ড ব্যাংক ফুলেফেঁপে উঠে। দেখা গেল, ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছে, রথসচাইল্ডের এক পুত্র ইংল্যান্ড সরকারকে আবার আরেক পুত্র ফরাসী সরকারকে লোন দিচ্ছে! ফলে যেই জিতুক বা হারুক, ভরে উঠছে রথসচাইল্ড পরিবারের ব্যাংক! প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধের পেছনে তাদের হাত আছে বলে নানা সময়ই গুঞ্জন ওঠে। তারাই বিভিন্ন শাসককে উস্কানি দেয় এবং টাকা ধার দেয়ার লোভ দেখিয়ে যুদ্ধে জড়ানোর চেষ্টা করে।

ইউরোপের ৫টি শহরে সবচাইতে ধনী পরিবারগুলোর সাথে ব্যবসার পাশাপাশি সারা ইউরোপজুড়ে নিজেদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে রথসচাইল্ডরা । ফলে অর্থনৈতিক দুনিয়ার কোথায় কি ঘটতে যাচ্ছে সেইটা আঁচ করার পাশাপাশি পরবর্তী "ঘটনাটি" ঘটানোর কাজটাও খুব ভালোভাবেই করতে পারতো তারা। এদের স্পাই ছিলো সর্বত্র। সব জায়গা থেকেই এই স্পাইরা খবর সংগ্রহ করতো, আর রথচাইল্ডরা নিজেদের টাকা, সম্পদ বাড়ানোর কাজে তা ব্যবহার করতো। ওয়াটারলুর যুদ্ধে ব্রিটিশদের টাকার যোগান দিচ্ছিল রথসচাইল্ডদের ব্যাংক। ব্রিটিশ রথচাইল্ড ব্যাংকের প্রধান নাথান রথসচাইল্ড একটা চাল চাললেন। স্পাইয়ের মাধ্যমে খবর পেলেন ব্রিটিশরা জিতে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি সস্তা দরে স্টক এক্সচেঞ্জে সব ব্রিটিশ শেয়ার বেচা শুরু করলেন! তাদের দেখাদেখি বাকি সব লোকেও তাদের শেয়ার বেচা শুরু করলো, তারা ভেবেছিল রথসচাইল্ডরা তো আর ভুল করবে না! ওদিকে নাথানের লোক গোপনে সব শেয়ার সস্তায় কিনে নিচ্ছিল। নাথানের লন্ডন ফেরার পরের দিনই জানা গেলো বৃটিশদের জয়ের কথা। একদিনেই নাথানের

সম্পদের পরিমান বেড়ে গেলো ২০ গুণ। নাথান রথচাইল্ডের হাত দিয়ে এভাবে বৃটিশ অর্থনীতি চলে এলো একটি মাত্র পরিবারের হাতে।

ওয়াটারলুর যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হলো। ফরাসী সরকার তখন বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে ধার করতে শুরু করে, রথসচাইল্ডদের বাদ দিয়ে। কারণ অহংকারী ফরাসী অভিজাতরা ইহুদী রথসচাইল্ডদের কাছে হাত পাততে চায়নি। তাদের মন যোগাতে রথসচাইল্ডরা পার্টি, উপহার, শিল্পকলার লেনদেন করেও পাত্তা পাচ্ছিলো না। আবারও নতুন চাল চাললো রথসচাইল্ড পরিবার। ১৮১৮ সালের অক্টোবরে তারা দ্রুত কিনে নিতে শুরু করলো ফ্রান্সের দুটো প্রধান কোম্পানীর সরকারী বন্ড। ফলে বন্ডের দাম বেড়ে গেলো বহু গুণে। এরপর হঠাৎ করেই পরের মাসে তারা একসাথে সব বন্ড বাজারে ডাম্প করাতে ফরাসী অর্থনীতির বারোটা বেজে গেলো! এইবার ফরাসী রাজা বাধ্য হলেন রথসচাইল্ডদের কাছে হার মানতে। পৃথিবীর দুটো প্রধান অর্থনীতি- বৃটেন ও ফ্রান্স রথসচাইল্ডের হাতের মুঠোয় চলে এলো।

১৮৭৫ সালে প্রথম ইহুদী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জায়গা করে নেন লায়োনেল রথসচাইল্ড। বিনিময়ে সেই সময় মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিশে ব্রিটিশ সরকারকে সেই সময়কার ৪ মিলিয়ন পাউন্ড ধার দেন, যা দিয়ে ব্রিটিশরা সুয়েজ খালের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়!

রথচাইল্ডদের টাকার জোরের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যারন রথসচাইল্ড ব্রিটিশ সরকারকে লোন দেন এই শর্তে, যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য নিজস্ব দেশ তৈরি করতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড বেলফোর রাজি হয়ে যে ঘোষণা দেন এই ইস্যুতে তা "বেলফোর ঘোষণা" নামে পরিচিত। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে বলা হয়, পৃথিবীতে ইসরাইল একমাত্র দেশ যা টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে!

আধুনিক যুগে এসে রথসচাইল্ড ফ্যামিলি অকল্পনীয় সম্পদের অধিকারী হয়েছে। তারা কখনোই তাদের সম্পদের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করে না। তাদের সম্পদ নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই কোম্পানীগুলোও তাদের পরিবারের লোকেরাই নিয়ন্ত্রন করে।

তাদের নিজের নামে খুব অল্প কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টিকে আছে। তাদের সম্পদ বেশিরভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা। তেল, কয়লা, ব্যাংক প্রভৃতি নানা ধরণের কোম্পানীতে তাদের বিনিয়োগ আছে। ধারণা করা হয় আমেরিকান কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা বড় ব্যাংকেই তাদের শেয়ার আছে। যারা আগে জানতেন না, তাদের জন্য তথ্য- আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক "ফেডারেল রিজার্ভ" একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো সরকারী ব্যাংক নয়। বর্তমানে এই বিশাল পরিবারের প্রধান হলেন লর্ড জেকব রথসচাইল্ড।

অনুমান করা হয় মোটামুটি ২০ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ আছে তাদের। ফোর্বসের ৮ জন শীর্ষ ধনীর সম্মিলিত সম্পদের প্রায় পাঁচ গুণ। তার মানে পৃথিবীর মোট জনগণের চারভাগের তিন ভাগ তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে।

২০১৫ সালে রথসচাইল্ড পরিবারের দুইজন প্রতিনিধির বাংলাদেশ সফরের খবর মেলে দেশের শীর্ষসারির এক গণমাধ্যম থেকে। 'বাংলাদেশে ব্যবসার সম্ভাবনা যাচাই করছে রথসচাইল্ড গ্রুপ' নামক শীর্ষ খবরের পর এই সংক্রান্ত আর কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি।

এই অল্প লোকের হাতে বিপুল সম্পদের জমা হওয়া নিশ্চিতভাবেই আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এর সমাধান কি তাও কেউ জানে না। এর পরিণতি কী, তা নিয়েও রয়েছে নানান দুর্ভাবনা আর সংশয়। নানা সময়ে এই বৈষম্য নিরসনে নানান থিওরীর জন্ম হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি একটিও। মনিরুল ইসলাম মণি | Feb ২০, ২০১৭ | অদ্ভুত,বিস্ময়,অবিশ্বাস্য, এরাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড |

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮০০৭

কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার ত্বরীকা এবং প্রচলিত তাবলীগিদের গোমরাহি!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-২২-২০১৭

কাফেরদেরকে কিভাবে দাওয়াত দেয়া হবে, তা মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসে এসেছে:

عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا امّر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.اه

.

“হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন জাইশ-বড় বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মুকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে; এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে: (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।" [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তা'মীরুল ইমামিল উমারা আ'লা বুয়ূস।]

এ হাদীসে কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে তাদের সাথে যখন সামনা সামনি মুকাবেলা হবে, তখন। অর্থাৎ মুসলমান বাহিনী প্রথমে দারুল হরবে গিয়ে কাফেরদেরকে অবরোধ করবে, যাতে তারা এদিক সেদিক পালিয়ে যেতে না পারে। পাকা-পোক্তা অবরোধ বসানোর পর তাদেরকে ইসলাম এবং তা গ্রহণ না করলে জিযিয়ার দাওয়াত দেবে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার এ ত্বরীকাটিই সর্ব-স্বীকৃত।

হিদায়া গ্রন্থকার (মৃত্যু: ৫৯৩হি.) বলেন,

"وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام" لما روى ابن عباس ﷺ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام. قال "فإن أجابوا كفوا عن قتالهم" لحصول المقصود وقد قال صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث. "وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية" به أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمراء الجيوش " ...فإن أبوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم" لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة "فإن أبوا ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم". اهـ

"মুসলমানগণ দারুল হরবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করার পর, (প্রথমত) হরবীদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, 'ইসলামের দাওয়াত দেয়া ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না'। যদি তারা এতে সাড়া দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে। কেননা, উদ্দেশ্য যা ছিল, তা হাসিল হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে'।

যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে জিযিয়া আদায়ের আহ্বান জানাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর প্রেরিত) বাহিনীর সেনা প্রধানদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন। ...

যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. এর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। ... যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে'।" [হিদায়া: ২/২৫২-২৫৩]

অতএব, ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হবে কাফেরদেরকে অবরোধ করার পর। আর দাওয়াতও শুধু ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের রাষ্ট্র মুসলামনদের হাতে সমর্পণ করতে এবং এরপর জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যিম্মি হয়ে থাকার আহ্বান জানাতে হবে। যদি এতে রাজি না হয়, তাহলে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইসলাম বা জিযিয়া কবুলে বাধ্য করতে হবে এবং তাদের রাষ্ট্রকে ইসলামী হুকুমতের অধীনে নিয়ে এসে দারুল ইসলামে পরিণত করতে হবে। যদি ইসলাম বা জিযিয়া কোনটাই কবুল করতে রাজি না হয়, তাহলে যাকে হত্যা করার হত্যা করতে হবে আর বাকিদেরকে গোলাম-বাঁদিতে পরিণত করতে হবে।

এ দাওয়াত হলো সেসব কাফেরদের বেলায়, যাদের কাছে ইতিপূর্বে দাওয়াত পৌঁছেনি। পক্ষান্তরে যাদের কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, ইসলাম নামক একটি ধর্ম

আছে, উক্ত ধর্ম যারা গ্রহণ না করবে কিংবা জিযিয়া দিতে রাজি না হবে, মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; যাদের কাছে এ কথা পৌঁছে গেছে তাদেরকে আর দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব:

এক. দাওয়াত দেয়ার দ্বারা মুসলামনদের ক্ষতির কোন আশংকা না থাকতে হবে। **দুই.** এই আশা থাকতে হবে যে, তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে কিংবা জিযিয়া আদায়ে সম্মত হবে।

পক্ষান্তরে যদি তারা এত উদ্ধত জাতি হয় যে, তাদের থেকে ইসলাম বা জিযিয়া কোনটারই আশা করা যায় না, বরং দাওয়াত দিতে গেলে তারা মুসলামনদের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটবে বলে আশংকা করা হচ্ছে; তাহলে এদেরকে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব নয়, বরং জায়েযই নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (মৃত্যু: ৫৯৩হি.) বলেন,

"ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة "مبالغة في الإندار، ولا يجب ذلك، لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، وعهد إلى أسامة ﷺ أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق، والغارة لا تكون بدعوة. اهـ

"যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে, অতিরিক্ত সতর্কীকরণার্থে তাদেরকে (পুনরায়) দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব; তবে আবশ্যক নয়। কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত হামলা করেছেন এবং উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দিয়েছেন, উবনা'র উপর অতর্কিত হামলা করে একে জ্বালিয়ে দিতে। আর অতর্কিত হামলা তো দাওয়াত দিয়ে হয় না।" [হিদায়া: ২/২৫২]

আল্লামা হাছকাফী রহ. (মৃত্যু: ১০৮৮হি.) বলেন,

(وندب دعوة من بلغته) ... لكن بشرطين، أحدهما: أن لا يكون في التقديم ضرر

بالمسلمين، كتحصن واحتيال، ولو بغلبة الظن، والثاني: أن يطمع فيهم ما يدعوهم إليه، كما في المحيط. اهـ

"যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাদেরকে (পুনরায়) দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব; তবে দুই শর্তে:

এক. এটা মুসলামনদের কোনরূপ ক্ষতির কারণ না হতে হবে। যেমন, প্রবল ধারণা হওয়া যে, (দাওয়াত দিতে গেলে) তারা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নেবে কিংবা অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করবে।

দুই. যে বিষয়ের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা তা কবুল করে নেবে বলে আশাবাদি হতে হবে। 'আল-মুহীত' এ এমনই বলা হয়েছে।" [আদ-দুররুল মুনতাক্বা: ২/৪১২]

এ হলো কাফেরদের দাওয়াত দেয়ার শরীয়ত-বর্ণিত পন্থা। তবে মনে রাখতে হবে, এ দাওয়াত হলো তখন, যখন কাফেররা তাদের নিজ দেশে অবস্থান করে, ইসলাম, মুসলমান বা কোন ইসলামী ভূমিতে আঘাত না হানে। পক্ষান্তরে যদি তারা কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসে, তখন আর কোন দাওয়াত নেই, বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করে মুসলিম ভূমিকে এসব নাপাক বাহিনী থেকে পবিত্র করা ফরয।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃত্যু: ১৮৯হি.) বলেন,

)ولو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم ، يقاتلهم {المسلمون} بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز...) أهـ .

"এমন কোন কাফের সম্প্রদায়, যাদের কাছে ইসলাম বা দাওয়াত কিছুই পৌঁছেনি, যদি তারা মুসলমানদের রাষ্ট্রে তাদের বিরুদ্ধে এসে পড়ে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য

মুসলমানরা কোন প্রকার দাওয়াত ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন তারা তাদেরকে হত্যা, বন্দি কিংবা তাদের মাল লুণ্টন- যাই করবে, সবই বৈধ...।"

ইমাম সারাখসী রহ. (মৃত্যু: ৪৯০হি.) ব্যাখ্যায় বলেন,

)والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم و أنفسهم فلا يجب الدعاء (أهـ .

"কেননা, তখন যদি তারা ইসলামের দাওয়াত দিতে যায়, তাহলে মুসলামানদের হত্যা, বন্দী বা মাল লুণ্টনের শিকার হতে হতে পারে। কাজেই তখন দাওয়াত দেয়া আবশ্যক হবে না।" [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ৫/২৫৩-২৫৪]

ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন,

)ومنها أن المسلمين يدعون الكفار –قبل قتالهم- إلى الإسلام هذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم ، ومستحب إن بلغتهم الدعوة ، هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم بغير دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم) أهـ

"যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানগণ কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। এটি আবশ্যক, যদি তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। আর দাওয়াত পৌঁছে থাকলে তখন মুস্তাহাব। এ হচ্ছে যখন স্বয়ং মুসলমানরা কাফেরদের উপর আক্রমণের জন্য যাবে। পক্ষান্তরে কাফেররা যখন মুসলিম ভূমিতে মুসলমানদের উপর হামলা করতে আসবে, তখন কোন প্রকার দাওয়াত ব্যতীতই তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে। কেননা, তখন তারা নিজেদের জান ও ভূমি রক্ষার জন্য লড়ছে।" [আহকামু আহলিয যিম্মাহ্: ১/৫]

তাবলীগিদের গোমরাহি:

আজ যখন প্রায় সবগুলো মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে, তখন মুসলমানদের উপর ফরয, তাদের জান-মাল সর্বস্ব ব্যয় করে কাফের-মুরতাদদের থেকে মুসলিম ভূমিগুলো উদ্ধার করা। ইসলাম ও মুসলমানকে এদের নাপাক থাবা হতে রক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রচলিত তাবলীগ পন্থীরা আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত এ বিধান ছেড়ে, কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে ব্যস্ত। তাও ঐ দাওয়াত নয়, যে দাওয়াত ইসলাম শিখিয়েছে। ঐ দাওয়াত তারা দিচ্ছে, যার পিছনে নেই কোন তরবারি, নেই কোন জিযিয়ার আহ্বান। এমন দাওয়াত, যে দাওয়াতে জান-মালের কোন আশংকা নেই। যে দাওয়াত শুধু ইসলামের ফরয বিধান তরকের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে দাওয়াত ইসলাম ও মুসলামনকে চরম অপদস্থি আর লাঞ্ছনার শিকার করেছে। যে দাওয়াত ছিল কাফেরের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার, সে দাওয়াতকে তারা কাফেরদের পা ধরে পড়ে থাকার দাওয়াতে পরিণত করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

এর চেয়ে পরিতাপের বিষয়, এই চরম গোমরাহি কোন নির্দিষ্ট এলাকা, নির্দিষ্ট কতক ব্যক্তি, এমনকি নির্দিষ্ট কতক জাতি-গোষ্ঠীর মাঝেও সীমাবদ্ধ রয়নি, বরং তা গোটা উম্মাহকে গ্রাস করেছে। গোটা উম্মাহর লাখো লাখো যুবককে আত্মমর্যাদাহীন আর পুরুষত্ব বিবর্জিত কতগুলো ভেড়ার পালে পরিণত করে ছেড়েছে। হিন্দুস্থান থেকে উদগত এই ফিতনা গোটা উম্মাহকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে। এটা এমন এক ফিতনা, যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আলেম-গাইরে আলেম, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই নিপতিত হয়েছে।

এ যেন ঐ হাদিসের বাস্তবায়ন, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বলে গিয়েছেন।

হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

سمعت رسول الله -ﷺ- يقول « إن الفتنة تجىء من ها هنا ». وأومأ بيده نحو

(আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেন, 'নিশ্চয়ই এই দিক থেকে ফিতনার আগমন ঘটবে; যেদিকে শয়তানের শিংদ্বয় উদিত হয়।) ***[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৮১]***

অনেক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথা তিনবার বলেছেন।

স্পষ্ট যে, হিন্দুস্তান মদীনা থেকে শুধু পূর্ব দিকেই নয়, বরং দুনিয়ার প্রায় শেষপ্রান্তে। মদীনা থেকে যত বেশি দূরে হবে, তত বেশি ফিতনা তাতে জন্ম নেবে, এটাই স্বাভাবিক। আজকের এই তাবলীগ এ হাদিসের প্রকৃষ্ট বাস্তবায়ন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমান আমল হিফাজত করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮০১৮

আপনার সন্তানের খবর নিন; সে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী না তো?

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-২৩-২০১৭

বিবর্তনবাদ একটা মৌলিক বিষয় হিসেবে স্কুল-কলেজগুলোতে পড়ানো হয়। এ মতবাদের মূলকথা হচ্ছে: (মানুষ আদিতে বানর ছিল। আস্তে আস্তে বিবর্তন হতে হতে মানুষে পরিণত হয়েছে।)

এ মতবাদে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় নিহিত, যা ইসলামের গোড়ার সাথেই সাংঘর্ষিক:

১. আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

২. দাবি করা হচ্ছে, সৃষ্টিজগৎ কোন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ব্যতীত আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে।

৩. সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এবং তিনি যে জান্নাত থেকে একজন মানবরূপে দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং পরবর্তী মানবপ্রজন্ম তার ও তার স্ত্রী হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম থেকে বিস্তার লাভ করেছে- তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

সন্দেহ নেই, এ তিনটার প্রত্যেকটাই সুস্পষ্ট কুফর এবং এ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি সর্বসম্মতিতে দ্বীনে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের।

অতীব পরিতাপের বিষয়, মুরতাদ সরকার তাদের পাঠ্যপুস্তকে এই কুফরী মতবাদকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভূক্ত রেখেছে। যদ্দরুণ নবপ্রজন্ম এই সকল কুফরী আকীদা পোষণ করেই বড় হচ্ছে। ১নং কুফরটাতে লিপ্ত না হলেও, দ্বিতীয় কি অন্তত তৃতীয়টাতে অনেকেই লিপ্ত হচ্ছে। এভাবে শুধু এ বিবর্তনবাদের কারণেই মুসলিম নামধারী একপ্রকার মুরতাদ প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে।

হে মুসলিম ভাই-বোনেরা, আপনারা আপনাদের সন্তানদের খবর নিন; তারা কি এখনোও ইসলামের উপর আছে? না ইতোমধ্যেই মুরতাদে পরিণত হয়েছে? অন্যথায়, এর দায়ভার কিয়ামতের দিন আপনাদের উপরই বর্তাবে। হে আল্লাহ, তুমি হিফাজত কর।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮০২৯

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) ও তার অনুসারি(সেকুলার)দের বিধান!!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১১-১৪-২০১৭

'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। **'ধর্মনিরপেক্ষ'** অর্থ- 'কোন ধর্মের পক্ষে নয়'। অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত।

"Seculaism" এমন একটি মতবাদ, যার মূলকথা হচ্ছে- রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ- 'ধর্মনিরপেক্ষতা' **[লা-দ্বীনী]** ও **[ধর্মহীনতা]**র সমার্থবোধক। ধর্মনরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, যাতে বলা হয়: মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো- বিশেষত রাজনীতিক সিদ্ধান্তগুলো- কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় জীবনেও হতে পারে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকও হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা

কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- তার শাসনব্যবস্থা ধর্মের আওতামুক্ত। ধর্মের সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক নেই এবং এসবের সাথে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন দিয়ে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা তার কোন বিধান ইসলাম ধর্মের অনুযায়ী হওয়া ধর্মনিরক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার" শ্লোগানটি দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা

কোন ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- সে কোন ধর্মের অনুসারী নয়। তার জীবন ধর্মের আওতামুক্ত। সে ইসলাম ধর্মের অনুসারিও নয়, অন্য কোন ধর্মেরও নয়। **উল্লেখ্য,** ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলবে, তবে অন্যান্য ধর্মও তাতে শান্তিতে পালন করা যাবে- যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবর্তক ও ধারক-বাহকদের নিকট ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ঐটিই যা পূর্বে বলা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা কুফর

মানব জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে- রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক, কি ব্যক্তি জীবনে- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সুস্পষ্ট কুফর। এ হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে কাফেরদের আবিস্কৃত নতুন মতবাদসমূহের একটি। দ্বীন ইসলামে এর কোন সুযোগ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্র: ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন- সর্বত্র অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়ত পরিচালকের আসনে থাকতে হবে। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ ইসলামী শরীয়ত। জীবনের কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়ত গ্রহণ না করা, নিজেকে শরীয়তের আওতাবাহির্ভূত ঘোষণা করা সর্বাবস্থায় কুফর- চাই এরপর অন্য কোন আদর্শ-মতবাদ গ্রহণ করুক বা না করুক। উল্লেখ্য, শরীয়তে কাফেরদের যতটুকু অধিকার দেয়া আছে, ততটুকু অধিকার দেয়া আমরা জরুরী মনে করি।

যারা ধর্মনিরপক্ষতাবাদের সমর্থক, প্রচারক, এর জন্য লড়াই করে তারা কাফের। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীন প্রত্যাখ্যান করে তার বিপরীতে ভিন্ন মতবাদকে বেছে নিয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত: ইয়াহুদ-নাসারা ও মক্কার মুশরেকরা

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি, যে নিজেকে ধর্মের আওতাবহির্ভূত ঘোষণা করে- সে হয়তো মক্কার মুশরেকদের মতো, নয়তো ইয়াহুদ-নাসাররা মতো।

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়, তাহলে সে ঐসব ইয়াহুদ-নাসারার মতো, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী জেনেও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

আর যদি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী না হয়, তাহলে সে মক্কার মুশরিকদের ন্যায়, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাসও করতো না, তাঁর প্রতি ঈমানও রাখতো না। অতএব, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হোক বা না হোক- সর্বাবস্থায় কাফের। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮১৫৫

মক্কী যিন্দেগী এবং আমাদের বর্তমান দুর্বল অবস্থার মধ্যকার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যবধান!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-২১-২০১৭

মক্কী যিন্দেগী এবং আমাদের বর্তমান দুর্বল অবস্থার মধ্যকার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যবধান!

মক্কী যিন্দেগী নিয়ে ব্যাপক ফেতনা ছড়ানো হচ্ছে। বিশেষত তাবলীগ জামাতের মাঝে এ ফেতনা বেশি। তারা বলে থাকে, *'আমরা মক্কী যিন্দেগিতে অবস্থান করছি। মক্কী যিন্দেগিতে মুসলমানরা দুর্বল ছিল, তাই তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়নি। তদ্রূপ, আজ আমরা দুর্বল। তাই আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।'*

এই ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণই গলদ। মক্কী যিন্দেগী আর আমাদের বর্তমান অবস্থার মাঝে অনেক বড় ব্যবধান। মক্কী যিন্দেগিতে জিহাদ ফরয করা হয়নি, বরং এর অনুমতিও দেয়া হয়নি। তাই তখন জিহাদ নিয়ে ভাবার দরকার ছিল না। কিন্তু নামায ফরয ছিল, তাই নামায নিয়ে ভাবতে হত। প্রকাশ্যে নামায পড়লে কাফেরদের নজরে পড়বে আশঙ্কা থাকলে গোপনে হলেও পড়তে হতো। নামায ছাড়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু মদীনায় যখন জিহাদ ফরয করা হল, তখন থেকে নামাযের ন্যায় জিহাদ নিয়েও ভাবতে হবে। আপাতত জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে, সামর্থ্য অর্জনের ফিকির করতে হবে। এখানেই ব্যবধানটা।

মক্কী যিন্দেগিতে জিহাদ যেহেতু ফরয ছিল না, তাই জিহাদের সামর্থ্য অর্জন ও ই'দাদের ফিকির সাহাবায়ে কেরামকে করতে হতো না। কিন্তু মদীনায় আসার পর যখন জিহাদ ফরয হল, তখন সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে- আমার উপর জিহাদ ফরয। যদি সামর্থ্যের অভাবে আপাতত জিহাদ করতে না পারি, তাহলে ফিকির করতে হবে- কিভাবে সামর্থ্য অর্জন করা যায়। অতএব, তখন থেকে ই'দাদের চিন্তা ও ফরজিয়্যাতের আকীদা সর্বাবস্থায় রাখতে হবে।

যেমন- একজন লোক দারুল হরবে মুসলমান হল। সে জানে, নামায ফরয। কিন্তু দারুল হরবে চতুর্দিকে কাফের। নামায পড়তে দেখলে জীবনের রক্ষা নাই। তখন সে আপাতত নামায ছেড়ে দিতে পারবে। কিন্তু তাকে মনে রাখতে হবে- তার উপর নামায ফরয। এই ফরয আদায়ের ফিকির করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে। কিভাবে, কোথায় গেলে বা কোন সময়ে কাফেরদের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে নামায আদায় করা যায়- সে চেষ্টা তাকে করতে হবে। আপাতত সুযোগ নেই বলে বসে থাকার অনুমতি নেই। জিহাদের অবস্থাও তেমনি। সর্বাবস্থায় তার ফরজিয়্যাতের আকীদা রাখতে হবে। সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ যে ফরয তা স্মরণ রাখতে হবে। ই'দাদের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে। বসে থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু মক্কী যিন্দেগিতে যখন জিহাদ ফরয ছিল না, তখনকার অবস্থা সম্পূর্ণই ভিন্ন। কাজেই, মক্কী যিন্দেগির বাহানা ধরে জিহাদ তরক করার সুযোগ নেই। অতএব, হে ভাই! সাবধান! ধোঁকায় যেন না পড়ি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৫১০

ভোট: ইসলামের নামে ধোঁকা!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-১৯-২০১৭

বিসমিল্লাহ্! ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহ্!

আম্মা বা'দ...

মুহতারাম এক ভাই **(ইসলামে ভোট হালাল কি?)** শিরোনামে ফোরামে একটা পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে একজনের একটা লেখা তুলে দিয়ে ইসলামে ভোটের বিধান কি তা জানতে চেয়েছেন। স্বাভাবিকই লেখাটি মুহতারাম ভাইয়ের কাছে আপত্তিজনক মনে হচ্ছে। লেখাটি বাস্তবেও তেমনি, বরং আরোও জঘন্য।

লেখকের লেখাটি মূলত তাকী উসমানী সাহেব যা বলেছেন তারই আপডেট ভার্সন। তাকী সাহেবের লেখাটার সাথে আরোও বিভিন্ন মাত্রা-উপমাত্রা যোগ করেছেন। হাকিকত ও বাস্তবতার অস্বীকার এবং ফেরেব ও ধোঁকায় আরেকটু অগ্রগতি এনেছেন।

আসলে এসব কথা এতই সুস্পষ্ট বাতিল ও ধোঁকায় পূর্ণ যে, সামান্য দ্বীনি-বুঝ সম্বলিত প্রতিটি মুসলমানেরই তা বুঝার কথা। কিন্তু যামানার আবর্তে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এসব অসাড় প্রলাপেরও রদ লিখতে হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

লেখকের দাবি- খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে ইসলামে সুনির্দিষ্ট কোন ত্বরীকা নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নির্ধারিত হবে: খলিফা কিভাবে নির্বাচিত হবে। এর দলীল তিনি দিয়েছেন- খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়া এক রকম ছিল না। একেক জন একেকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। কাজেই বুঝা গেল- খলিফা নির্বাচনে ইসলামে নির্ধারিত কোন ত্বরীকা নেই। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে খলিফা নির্ধারিত হবে। তবে মতামত প্রদানের ত্বরীকা সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হবে। আর মতামত

প্রদানের আধুনিক পদ্ধতি হল- ভোট। কাজেই ভোট আধুনিক যামানায় খলিফা নির্বাচনের ইসলামী ত্বরীকা।

লেখক এখানে অনেকগুলো বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়ে কোনমতে ধামা-চাপা দিয়ে গলার জোরে নিজের দাবি প্রমাণ করার বরং অকাট্য সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ এই বাস্তবতাগুলো এড়িয়ে গিয়ে কিছুতেই খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতির দিকে যাওয়া যায় না। এই বাস্তবতাগুলোর উপর সামান্য একটু আলোকপাত এখানে আমি করছি-

• আমাদের আলোচনা প্রথমে খলিফা নির্বাচন নিয়ে হবে না, বরং আলোচনা হবে কুফরী শাসন দিয়ে শাসনকারী তাগুত ও মুরতাদ শাসকদেরকে অপসারণ নিয়ে। প্রশ্ন করি- মুরতাদদের হটানোর জন্য শরীয়ত কি ভোটে নামতে আদেশ দিয়েছে না'কি কতল ও কিতালের আদেশ দিয়েছে? মুরতাদের শাস্তি কি ভোটের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করে দেয়া, না'কি হত্যা করা? অপসারণ করে ক্ষান্ত রাখা তো পরের কথা, কোন মুরতাদকে হত্যা না করে জেলে ভরে রাখার অনুমতিটুকুও কি শরীয়ত দেয়? উত্তর যদি না হয়, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ভোটে নামবো কোন শরীয়তের আলোকে?!

• লেখক হয়তো বলবেন- 'আমরা তাগুতদেরকে মুরতাদ মনে করি না।' তাহলে জিজ্ঞেস করি- কি মনে করেন? অবশ্যই জঘন্য রকমের জালেম ও পাপিষ্ঠ মনে করেন? আর এরা অবশ্যই সাধারণ জালেম শাসকের মতো নয়। কারণ-
- সাধারণ জালেম শাসকরা শরীয়ত প্রত্যাখান করে কুফরী শাসনব্যবস্থা চালু করে না।
- সাধারণ জালেম শাসকরা তাগুত নয়, কিন্তু এরা তাগুত।

- সাধারণ জালেম শাসকরা কাফেরদের দ্বারা নির্বাচিত তাদেরই অনুগত দাস ও দালাল কিংবা তাদের কুফরের একনিষ্ঠ সাহায্যকারী নয়, কিন্তু এরা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

কাজেই এদের বিধান সাধারণ জালেম শাসকদের বিধান নয়। এখন লেখককে জিজ্ঞাস করি- শরীয়তের কোথায় এসব জালেম তাগুতকে অপসারণের জন্য ভোটে নামার আদেশ দিয়েছে আমাদের একটু দেখাবেন কি?

• বর্তমান ভোটাভুটিকে খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ফেরেব ও ধোঁকা। কারণ- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কিংবা আবু বকর রাদি., উমর রাদি., উসমান রাদি., বা আলী রাদি. এর কারো ওফাতের পর মুসলিম বিশ্বের অবস্থা হল- খলিফার পদ খালি রয়েছে, জরুরী ভিত্তিতে একজন খলিফা নির্বাচন করতে হবে। পক্ষান্তরে বর্তমানের অবস্থা হল- কাফের ও তাগুত-মুরতাদরা মুসলিম খলিফা ও সুলতানগণকে অপসারণ করে, মুসলিমদেরকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্ব তাদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের ফরজ দায়িত্ব- এসব কাফের মুরতাদ ও তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে হটানো। এরপর সামর্থ্যানুযায়ী একজন খলিফা নিয়োগ দেয়া। খলিফা সম্ভব না হলে অন্তত সুলতান নিয়োগ দেয়া। এই দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আগে খলিফা নির্বাচনের স্লোগান উঠানো মূলত ফরয দায়িত্ব এড়ানোর একটা বাহানা। শুধু তাই নয়, বরং মনগড়া এই ভোটাভুটিকে শরীয়ত-নির্ধারিত দায়িত্ব আখ্যায়িত করে নিজেদের গোমরাহি ঢাকা দেয়ার অপচেষ্টা। শুধু তাই নয়, বরং গোটা উম্মাহকে এই গোমরাহিতে লিপ্ত করার অনন্ত প্রয়াস।

• দ্বিতীয়ত: লেখকের দাবি খলিফা নির্বাচনে ইসলামে নির্ধারিত কোন ত্বরীকা নেই। বাতিলপন্থীদের অনেকেই এ দাবিটি করে থাকে। এর উদ্দেশ্য- যাতে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিকে ইসলামের নামে চালিয়ে দিতে পারে। পক্ষান্তরে তারা যদি মেনে নেয়- ইসলামে খলিফা নির্বাচনের নির্ধারিত পন্থা রয়েছে, তাহলে তাদের ধোঁকার রাজনীতি মাঠে মারা যাবে। জনগণের কাছে তারা শরীয়তবর্জনকারী নব্য-বিদআতি মতালম্বী বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য তারা হাঁক-ডাক করে বেড়ায়: ইসলামে খলিফা নির্বাচনে নির্ধারিত কোন পন্থা নেই। এর পক্ষে খোঁড়া দলীল- খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়া একেজনের একেক রকম ছিল।

কিন্তু এই ফেরেববাদিদের কে বুঝাবে যে, ***খুলফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার দ্বারা খলিফা নির্বাচনে স্বাধীনভাবে মনগড়া যা ইচ্ছা তা-ই করার সুযোগ সৃষ্টি হয় না, বরং খলিফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া কি হবে তা সুনির্ধারিত হয়।*** উম্মাহর ফুকাহায়ে কেরাম এমনই বুঝেছেন। তেরোশ বছর এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু আজ যামানার আবর্তে এই ফেরেববাদিদের জন্ম হল, যারা এসে দাবি করছে- ইসলামে খলিফা নির্বাচনে নির্ধারিত কোন পন্থা নেই।

খুলাফায়ে রাশিদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে ফুকাহায়ে কেরাম খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি দুটির কোন একটি হবে বলে নির্ধারণ করেছেন:

এক.

الأختيار তথা উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ যারা আছেন, তারা উপযুক্ত একজন ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করবেন। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মদীনার আহলে হল ওয়াল আকদ সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রাদি. কে নির্বাচন করেছেন। তেমনই উসমান রাদি. এর শাহাদাতের পর আলী রাদি. কে নির্বাচন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, খলিফা নির্বাচনের অধিকার কেবল উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিগণই রাখেন। সাধারণ জনগণ এই অধিকার রাখে না। হযরত উসমান রাদি. এর শাহাদাতের পর লোকজন আলী রাদি. এর হাতে বাইয়াতের জন্য আসে। তখন তিনি বলেন-

ليس ذلك إليكم، إنما هو لاهل الشورى وأهل بدر، فمن رضى به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة، فنجتمع وننظر في هذا الامر فأبى أن يبايعهم، فانصرفوا عنه. اهـ

"তোমাদের এই অধিকার নেই। এটা তো আহলে শূরা এবং বদরী সাহাবীদের দায়িত্ব। আহলে শূরা এবং বদরী সাহাবীরা যাকে নির্বাচন করবে, তিনিই খলিফা হবেন। তাই আমরা সমবেত হয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করবো। তিনি বাইয়াত নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে তারা চলে গেল।" **['আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাহ্' লি-ইবনি কুতাইবা (মৃত্যু: ২৭৬হি.): ১/৯৯]**

দুই.

الاستخلاف তথা পূর্ববর্তী খলিফা, তার পরে কে খলিফা হবেন তার প্রস্তাব করে যাওয়া। যেমন- আবু বকর রাদি. তাঁর পর উমর রাদি. এর প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন, উমর রাদি. তাঁর পর ছয় জনের মধ্য থেকে এক জনকে খলিফা নির্বাচন করার প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী খলিফার এ প্রস্তাবের দ্বারাই প্রস্তাবিত ব্যক্তি খলিফা হয়ে যাবেন না, বরং উম্মাহর আহলে হল

ওয়াল আকদ ব্যক্তিগণ যদি তার প্রস্তাবকে কবুল করে নিয়ে প্রস্তাবিত ব্যক্তির হাতে খেলাফতের বাইয়াত দেন, তাহলেই কেবল তিনি খলিফা হবেন, অন্যথায় নয়।

ফুকাহায়ে কেরাম এই দুই পদ্ধতির কথাই বলে গেছেন। তৃতীয় কোন পন্থার কথা বলে যাননি।

সাথে সাথে তার সুস্পষ্ট বলে গেছেন, খলিফা নির্বাচনের অধিকার শুধু আহলে হল ওয়াল আকদ যারা থাকবেন, তাদেরই রয়েছে। অন্য কারো তাতে কোন অধিকার নেই। সাথে সাথে তাঁরা এও বলে গেছেন, কয়েক প্রকার ব্যক্তি খলিফা নির্বাচনের অধিকার রাখে না-

১. কাফের, চাই হারবী হোক কি যিম্মি হোক।

২. ফাসেক মুসলমান।

৩. সাধারণ দ্বীনদার মুসলমান, যারা খলিফা নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত শরয়ী ও জাগতিক ইলম, হিকমত ও অভিজ্ঞতা রাখে না।

৪. মহিলা।

৫. নাবালেগ।

শরীয়ত যেখানে সাধারণ মুআমালাতেও এদের রায় গ্রহণ করে না, সেখানে খলিফা নির্বাচন, যা গোটা উম্মাহর সাথে জড়িত- সেখানে কিভাবে এদের রায় গ্রহণ করবে??

কিন্তু তেরোশ বছর পর আজ নব্য বিদআতি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা দাবি করছে, ইসলামে খলিফা নির্বাচনের নির্ধারিত কোন পন্থা নেই। মুসলিম-কাফের, নাস্তিক-মুরতাদ, যিন্দিক-মুলহেদ, আদেল-ফাসেক, মহিলা-পুরুষ, বালেগ-নাবালেগ সকলকেই তারা খলিফা নির্বাচনের অধিকার দিয়ে দিয়েছে। আবার দাবি করছে- এটাই নাকি আধুনিক যামানায় ইসলামী ত্বরীকা। লা'নত এই ত্বরীকার উপর যা কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত, লা'নত এই ত্বরীকার উপর যা সালাফে সালেহীনের পরিপন্থী, লা'নত এই ত্বরীকার উপর যা ঈমান-কুফর, মুসলিম-

অমুসলিম, ফাসেক ফুজ্জার সকলকে বরারব বানিয়ে ফেলেছে। কসম আল্লাহর! কিছুতেই এই ত্বরীকা ইসলামী ত্বরীকা হতে পারে না। আল্লাহ যদি কাউকে অন্ধ না বানিয়ে দেন, তাহলে অবশ্যই তা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহীহ ইলম দান করুন। ফিরাসত, বাসীরত ও অন্তর্দৃষ্টি দান কর। সব রকরেম ফিতনা ও গোমরাহি থেকে হিফাজত কর। আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৪৯৮

ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা- একটি সংশয় ও নিরসন!

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-৩০-২০১৭

ইসলামে
খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা-
একটি সংশয় ও নিরসন!

এক ভাই পোস্ট দিয়েছেন, *ইসলামে খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে এক জনের সংশয় দেখা দিয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোন শূরা ছাড়াই নির্বাচন করা হয়েছে। আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই নির্বাচন করে গিয়েছেন, যা স্বৈরতন্ত্রের মতো দেখাচ্ছে।* এই সংশয় নিরসন কল্পেই আমার এ লেখা।

ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা

ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা কি? এক কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে- (উম্মাহর রেজা তথা সন্তুষ্টি)। উম্মাহ যাকে খলিফা নির্ধারণ করে নেবে তিনিই খলিফা হবেন, অন্য কেউ নন। তবে উম্মাহর পক্ষ থেকে খলিফা নির্বাচনের এই দায়িত্ব পালন করবেন উম্মাহর 'আহলে হল্ ওয়াল আকদ' ব্যক্তিগণ। 'আহলে হল্ ওয়াল আকদ' হচ্ছেন- উম্মাহর ঐসকল আলেম উলামা, আমীর-উমারা, গভর্নর, সৈন্যপ্রধান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে উম্মাহ মেনে চলে। যাদের সন্তুষ্টি উম্মাহর সন্তুষ্টি বলে গণ্য হয়। যারা কাউকে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দিলে উম্মাহর সকলে কিংবা অধিকাংশ ব্যক্তি তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেবে। যারা কাউকে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দিলে উক্ত খলিফার এ পরিমাণ সমর্থক হয়ে যাবে এবং এ পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য অর্জন হয়ে যাবে যে,

তখন উম্মাহর কোন একটা অংশ খলিফার বিরোধিতায় চলে গেলেও তারা খলিফাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে সমর্থ্য হবে না।

মোটকথা- খলিফা হওয়ার জন্য এ পরিমাণ শক্তি সামর্থ্য লাগবে যে, তিনি তার বিরোধিদের দমন করতে পারবেন, হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন, চোর-ডাকাত-সন্ত্রাসী ইত্যাদি বিশৃখলা ও নাশকতাকারীদের দমন করতে পারবেন, লোকদের মাঝে শরীয়তের বিধান কায়েম করতে পারবেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবেন; যারা সন্তুষ্ট চিত্তে শরীয়ত মানতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে শক্তি ও বল প্রয়োগে জোরপূর্বক শরীয়ত মানতে বাধ্য করতে পারবেন। খলিফা হওয়ার জন্য এ পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য, সমর্থক ও সৈন্যবাহিনী আবশ্যক। আর এই পরিমাণ সমর্থক, সামর্থ্য ও সৈন্যবাহিনী উম্মাহর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাইয়াতের দ্বারা অর্জন হবে- তারাই হলেন আহলে হল ও ওয়াল আকদ। সাধারণভাবে বলতে গেলে এঁরা উম্মাহর- নেতৃত্বস্থানীয় আলেম উলামা, আমীর-উমারা, গভর্নর, সেনাপ্রধান এবং সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে উম্মাহ মেনে চলে এবং তারা যে সিদ্ধান্ত দেন উম্মাহ তা মেনে নেয়।

বি.দ্র.

শুধু মুত্তাকী, পরহেযগার, বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য আলেম হলেই বা গণ্য মান্য কেউ হলেই আহলে হল ওয়াল আকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবেন না। আহলে হল ওয়াল আকদ হওয়ার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যাবশ্যক যে, উম্মাহ তার কথা মেনে চলে। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন সমাজের লোক তা মেনে নেবে। তার বাইয়াতের দ্বারা বাইয়াতকৃত ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ রকম না হলে আহলে হল ওয়াল আকদ হবেন না।

যদি এমন কতক ব্যক্তি বাইয়াত দেয়, যাদের বাইয়াতের দ্বারা বাইকৃত ব্যক্তির উল্লিখিত পরিমাণ সামর্থ্য ও সমর্থক সৃষ্টি হয়নি, তাহলে উক্ত ব্যক্তি খলিফা হবে না।

দ্বিতীয়ত: আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরে মতবিরোধ দেখা দিলে তখন তাদের অধিকাংশ যাকে বাইয়াত দেবেন তিনিই খলিফা হবেন। বাকি সংখ্যক বিরোধিদের বিরোধিতার কারণে খলিফা হওয়াতে কোন সমস্যা হবে না। কেননা,

তাদের অধিকাংশের বাইয়াতের দ্বারা এ পরিমাণ শক্তি সামর্থ্য অর্জন হয়ে যাবে যে, বাকিদের বিরোধিতায় তার ক্ষমতার মধ্যে কোন প্রভাব পড়বে না।

শূরা আবশ্যক

আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিবর্গের অবশ্য কর্তব্য- কাউকে বাইয়াত দেয়ার আগে অন্যান্য আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে নেয়া। পরামর্শের পর তাদের সকলে কিংবা অধিকাংশ যাকে বাইয়াত দেবেন তিনিই খলিফা হবেন। পরামর্শ ব্যতীত শুধু স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি মিলে কাউকে বাইয়াত দেয়া জায়েয নয়। যদি কেউ এ ধরণের বাইয়াত দেয়, তাহলে শরীয়তে এই বাইয়াতের কোন মূল্য নেই। এ বাইয়াতের দ্বারা কেউ খলিফা হবে না, বরং বাইয়াত দেয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তির সম্মুখিন করা হবে। বিশেষ পরিস্থিতি হলে তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করার বিধান আছে।

খলিফার অসিয়ত

বর্তমান খলিফা যদি তার পর কে খলিফা হবে- তার নাম ঘোষণা করে যান, তাহলে তার এ ঘোষণা একটা প্রস্তাবরূপে গৃহীত হবে। পরবর্তীতে উম্মাহ উক্ত ঘোষিত ব্যক্তিকে বাইয়াত দিলে তিনি খলিফা হবেন, অন্যথায় নয়।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমার তিনটি বিষয় পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য-

১. খলিফা নির্বাচন করবেন উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিবর্গ। সাধারণ ব্যক্তিদের রায় এখানে ধর্তব্য নয়।

২. আহলে হল্ ওয়াল আকদের জন্য আবশ্যক-বাইয়াতের আগে পরামর্শ করে নেয়া। পরামর্শ ব্যতীত কাউকে বাইয়াত দেয়া জায়েয নয় এবং এ বাইয়াতের কোন মূল্য নেই।

৩. খলিফার অসিয়ত একটা প্রস্তাবের মর্যাদার উর্ধ্বে কিছু নয়।

***

সংশয়

উপরোক্ত আলোচনাটি আমি করেছি ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য। ভাইয়ের

প্রশ্ন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে ঘিরে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়ের নির্বাচন পদ্ধতিটাই ঝামেলা মনে হচ্ছে । কারণ- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে বাইয়াত দেয়া হয়নি। বরং তখন সাক্বিফায়ে বনি সায়িদাতে যে সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম উপস্থিত ছিলেন তারাই তাঁকে বাইয়াত দিয়েছেন প্রথমত। বাকি সাহাবী ও অন্যান্য মুসলমানের সাথে পরামর্শ করে তারপর বাইয়াত দেয়া হয়নি। কাজেই এখানে আপত্তি আসছে- শূরা ছাড়াই তাঁকে খলিফা নির্বাচন করা হল।

আর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বয়ং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ওফাতের পূর্বে নির্বাচন করে গেছেন। এখানে আপত্তি আসছে যে, তা স্বৈরতন্ত্রের মত হয়ে গেল।

উত্তর:

আসলে পূর্ণ ইতিহাস না জানা থাকার কারণে আপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ের নির্বাচনের বিস্তারিত ইতিহাস জানা থাকলে আর আপত্তি হতো না। আমি সংক্ষেপে বিষয়টা বুঝাতে চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ-

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত

সাহাবায়ে কেরামের কাছে সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত ছিল- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবেন। তা বিভিন্ন কারণে:

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

- বিভিন্ন হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবেন ।

- বিভিন্ন হাদিসের ইশারা।

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পূর্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে নামাযের ইমামতি করানো।

- নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এসব কারণে সাহাবায়ে কেরামের নিকট স্পষ্ট ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা হবেন। কাজেই তারা তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে মানসকিভাবে আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আনসারী সাহাবীগণ সাক্বিফায়ে বনি সায়িদাতে জড়ো পরামর্শের জন্য যে, এখন আমীর কে হবেন? খবর পেয়ে মুহাজির সাহাবাগণও সেখানে উপস্থিত হন।

আনসারী সাহাবীদের জানা ছিল না যে, উম্মাহর খলিফা একাধিক হতে পারে না। তাই তারা প্রস্তাব করেন, আমরা আনসারদের থেকে একজন আমীর হোক আর আপনাদের– অর্থাৎ মুহাজিরদের- থেকে একজন আমীর হোক। আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর নির্ধারণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করে জানান যে, খলিফা একাধিক হতে পারে না এবং খলিফা কুরাইশি হওয়া শর্ত। আনসাররা যেহেতু কুরাইশি নন তাই তারা খলিফা হতে পারবেন না। তাই মুহাজিরদের থেকেই খলিফা বানাতে হবে।

এমতাবস্থায় আশঙ্কা ছিল, যদি আনসারদের কিছু অবুঝ লোক হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাইয়াত দিয়ে দেন, তাহলে পরবর্তীতে তাকে অপসারণ করে মুহাজিরদের কাউকে খলিফা নির্ধারণ করতে গেলে একটা ফিতনা দেখে দেবে। উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হবে। এই আশঙ্কায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে বাগেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আপনার হস্ত প্রসারিত করুন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হব। এই বলে তিনি এক রকম জোর করেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত দিয়ে দেন। দেখাদেখি উপস্থিত বাকি সাহাবায়ে কেরামও তাকে বাইয়াত দিয়ে দেন। কারণ, আগেই বলে এসেছি- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা বানাতে সাহাবায়ে কেরাম আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন।

এই বাইয়াতের পরের দিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহণ করেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় আগমন করেন। তারা তার হাতে বাইয়াত দেন। এভাবে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন।

সংশয়

বাহ্যিকভাবে এখানে সংশয় সৃষ্টি হয়- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ আরো যে ক'জন সাহাবী সর্বপ্রথম বাইয়াত দেন, তারা তো কোন পরামর্শ ছাড়াই বাইয়াত দিয়েছেন। অথচ আমি পূর্বে বলে এসেছি, পরামর্শ ছাড়া কাউকে বাইয়াত দিয়ে দেয়া জায়েয নয় এবং এ ধরণের বাইয়াতের দ্বারা কেউ খলিফাও হবে না। তাহলে এখানে-

- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে বাইয়াত দিলেন?

- এ বাইয়াতের দ্বারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা কিভাবে হলেন?

নিরসন

প্রথম কথা হল- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আরো যারা প্রথমে বাইয়াত দিয়েছেন, তাদের এই বাইয়াতের দ্বারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হননি, বরং খলিফা হয়েছেন যখন সাকিফায়ে বনি সায়িদার বাকি সাহাবায়ে কেরাম এবং পরের দিন মিম্বরে নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম বাইয়াত দিয়েছেন- তখন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

أنه متى صار إماما، فذلك بمبايعة أهل القدرة له ... ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة. اهـ

"তিনি কখন ইমাম হয়েছেন? তা হয়েছে যখন ক্ষমতাশীলগণ তাকে বাইয়াত দিয়েছেন। ... যদি এমন হতো যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথে আরোও কতকে তাকে বাইয়াত দিয়েছেন, কিন্তু বাকি সাহাবায়ে কেরাম বাইয়াত থেকে বিরত থেকেছেন, তাহলে তিনি ইমাম হতেন না। জুমহুরে সাহাবা, যারা ক্ষমতা ও দাপটের অধিকারী, তাদের বাইয়াতের পরই কেবল তিনি ইমাম হয়েছেন।" (মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/৫৩০)

দ্বিতীয়ত: উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পরামর্শ ছাড়াই বাইয়াত দিয়ে দিলেন তা কিভাবে জায়েয হল?

এর উত্তর: প্রথমত সাহাবায়ে কেরাম আগে থেকেই জানতেন এবং তারা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবেন। এ কারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাইয়াত দেয়ার পর কেউ তাতে আপত্তি জানাননি, বরং স্বতস্ফূর্তভাবে সকলে বাইয়াত দিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: আনসারিদের কোন কোন অবুঝ লোক সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাইয়াত দিয়ে দিলে একটা ফিতনা সংঘটিত হওয়ার এবং মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য তিনি আগে বাগে বাইয়াত দিয়ে দিয়েছেন। তার এ বাইয়াতের দ্বারা কোন ফিতনা তো হয়-ই-নি বরং ফিতনা আগমনের পূর্বেই তা দূর হয়েছে। তাই তা জায়েয হয়েছে। এমন বিশেষ পরিস্তিতিতে এ বাইয়াতই দরকার ছিল।

এ থেকে এই ফলাফল বের করা যাবে না যে, পরামর্শ ছাড়াই যে কেউ যে কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিতে পারবে এবং এই বাইয়াতের দ্বারা উক্ত ব্যক্তি খলিফা হয়ে যাবে- যেমনটা আবু বকর বাগদাদির বেলায় ঘটেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং নিজেই এ ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি শুনিয়ে গেছেন। এক ব্যক্তি বললো, উমরের ওফাতের পর আমি অমুকের হাতে বাইয়াত হয়ে যাবো। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। মদীনায় এসে সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন-

))بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلايبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا((

"আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তোমাদের এক ব্যক্তি বলছে- 'আল্লাহর শপথ, উমর মারা গেলে আমি অমুকের হাতে বাইয়াত হয়ে যাব।' সাবধান! কোন ব্যক্তি যেন ধোঁকায় পড়ে বলে না যে, 'আবু বকরের বাইয়াত তো পরামর্শ ছাড়াই হয়েছিল, এরপর তা পূর্ণতায় পৌঁছেছে।' শুনে রাখ! আবু বকরের বাইয়াত এমনভাবেই হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার ফলে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মানুষ আবু বকরের আনুগত্যের দিকে যেভাবে ধাবিত হয়েছে, তার দিকেও তেমনই ধাবিত

হবে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে বাইয়াত হবে, তাহলে তাকেও বাইয়াত দেয়া যাবে না, সে যার হাতে বাইয়াত দিয়েছে তাকেও না। কেননা, আশঙ্কা আছে, তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।" (সহীহ বুখারি: ৬৮৩০)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওফাতের পূর্বে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন, তার ওফাতের পর কে খলিফা হতে পারে? তারা রায় দেন- উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলিফা হবেন। তিনিই আপনার পর সবচেয়ে যোগ্য মানুষ। এভাবে ব্যাপকভাবে পরামর্শ করার পর তিনি অসিয়ত করে যান, তার ওফাতের পর যেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা বানানো হয়।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হয়ে যান। এভাবে তিনি খলিফা হন।

এখানে প্রশ্ন হল- তিনি কখন খলিফা হয়েছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসিয়তের দ্বারা? না'কি পরে যখন সাহাবায়ে কেরাম তার হাতে খেলাফতের বাইয়াত দিয়েছেন তখন?

উত্তর: বাইয়াত দেয়ার পর। শুধু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাবের দ্বারা তিনি খলিফা হননি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলন,

وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما. اهـ

"তেমনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করে গেলেন, তখন তিনি খলিফা হয়েছন যখন সাহাবায়ে কেরাম তার হাতে বাইয়াত হয়েছেন এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। যদি তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসিয়ত বাস্তবায়ন না করতেন, তাহলে তিনি- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু- ইমাম হতেন না।" (মিনহাজুস সুন্নাহ: ১/৫৩০)

এখানে স্বৈরতন্ত্রের কোন নাম গন্ধও নেই, বরং সাহাবায়ে কেরাম স্বেচ্ছায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নির্বাচন করেছেন।

আশাকরি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সময় সুযোগ থাকলে কুরআন, হাদিস ও ইতিহাস থেকে বিস্তারিত আলোচনা করতাম। যতটুকু বলেছি- আশাকরি মূল কথাটুকু এসে গেছে। যদি কেউ বিস্তারিত আলোচনা করে দেন, তাহলে বড়ই ভাল হয়।

এ ব্যাপারে আমি ভাইদের দু'টি কিতাব পড়ার নসীহত করবো-

-الوجيز في فقه الخلافة (د\صلاح الصاوي)

-مسائل في فقه الخلافة (الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي)

والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم

pdf:
https://my.pcloud.com/publink/show?c...m٩fsyD٥٥LYpxHy

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৫৮৪